ইউনিট ১
গাভীর জাত উন্নয়ন

ইউনিট ১ গাভীর জাত উন্নয়ন

গাভী পালনকে লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উন্নতজাতের গাভীর। যে সমস্ত গাভী কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে পালন খরচের তুলনায় অধিক উৎপাদনে সক্ষম তাদেরকে উন্নত জাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উন্নত জাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রজনন কর্মসূচী এবং ভবিষ্যত বংশধর সৃষ্টিতে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। এজন্যই বিভিন্ন প্রজনন পদ্ধতি, গাভীর প্রজননতন্ত্র, কৃত্রিম প্রজনন কৌশল, গর্ভ ও প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, ষাঁড় ও গাভীর জননতন্ত্র, বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র, গরম হওয়ার লক্ষণ ও করণীয়, কৃত্রিম প্রজনন, গর্ভাবস্থা নির্ণয়, গর্ভ ও প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা, গরম হওয়া বকনা বা গাভী শনাক্তকরণ, গর্ভবতী বকনা বা গাভী শনাক্তকরণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১ এর মূল উদ্দেশ্য ও পাঠ বিন্যাস

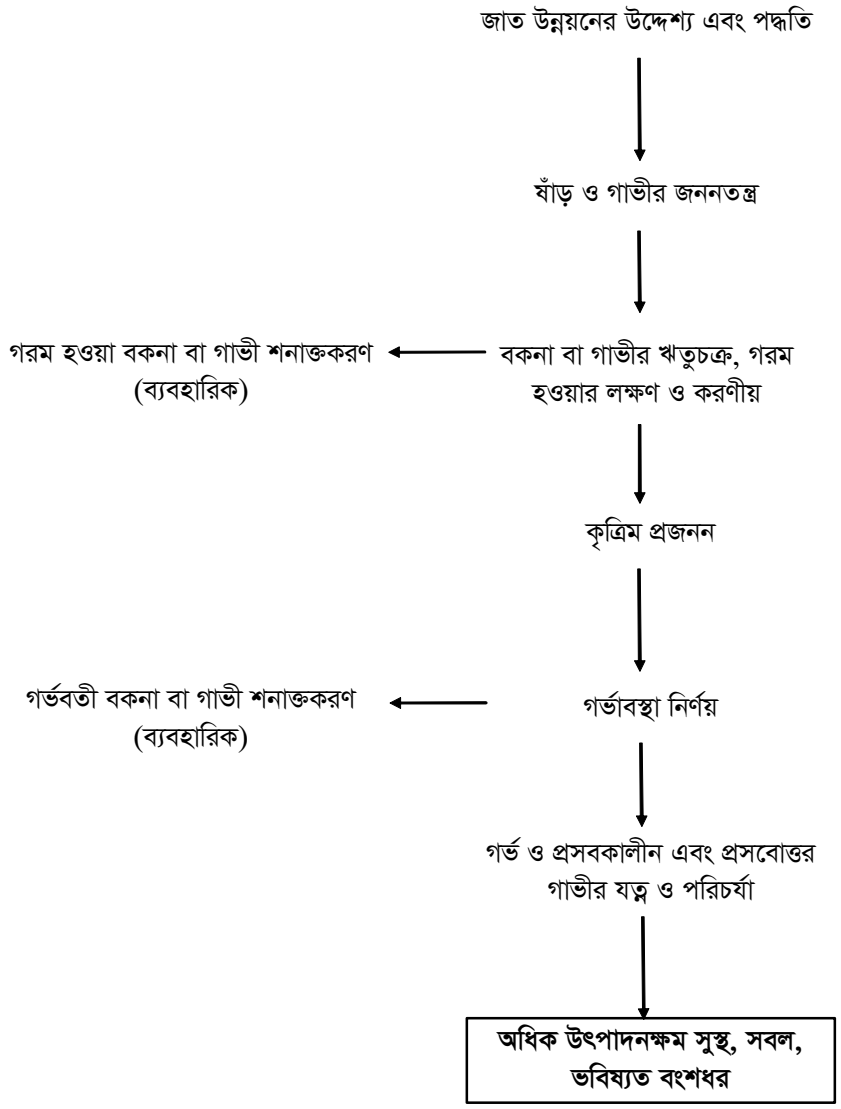

পাঠ ১.১ জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাছাই সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন সমাগম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের গবাদিপশুর উন্নয়নে ONBS পদ্ধতির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

পৃথিবীতে কবে কখন পশুপাখি গৃহপালিতকরণ শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ধারনা করা হয় যে পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষভাগে এবং নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতে মানুষ পশুপাখি পালন শুরু করে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ গৃহপালিত পশু থেকে অধিক উৎপাদন পাওয়ার চিন্তা করতে থাকে। রবার্ট ব্যাকওয়েল থেকে শুরু করে মেন্ডেলের সূত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক কৌলিবিজ্ঞান ও পশু প্রজনন বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। কৌলিবিজ্ঞানের জ্ঞান ও মূলনীতিকে কাজে লাগিয়ে পশু প্রজনন বিদ্যার মাধ্যমে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন দেশের স্থানীয় অনুন্নত জাতের উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য

জাত উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গবাদিপশুর কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন– দুধ উৎপাদন, দৈহিক বৃদ্ধি, যৌন পরিপক্কতা, মাংস উৎপাদন ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন। এ উন্নয়ন দু'ভাবে ঘটানো যায়– ক) কৌলিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে (Genetic improvement) এবং খ) পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটিয়ে (Environmental বা Non Genetic improvement)।

উপযুক্ত খাদ্য, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটানো যায়। কিন্তু কৌলিক মানের উন্নয়নের জন্য চাই সঠিক প্রজনন কৌশল।

> পশু প্রজননের দুটো হাতিয়ার রয়েছে– বাছাই (Selection) ও সমাগম (Mating)।

গবাদিপশুর প্রজনন কৌশল ঠিক করার পূর্বে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে প্রজনন কী উদ্দেশ্যে করা হবে বা কোন্ বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটানো হবে। পশু প্রজননের দুটো হাতিয়ার রয়েছে– বাছাই (Selection) ও সমাগম (Mating)।

বাছাই (Selection)

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য প্রথমেই দরকার নির্দিষ্ট দেশের প্রাপ্ত জাতগুলোর মধ্যে বাছাই করে অধিক উৎপাদনক্ষম ও অধিক গুণাগুণ সম্পন্ন গবাদিপশু নির্বাচন করা। বাছাই কার্য সঠিক ও উন্নত না হলে প্রজনন কর্মসূচী কখনোই সফল হবে না।

বাছাই পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকার–

১. ট্যানডেম পদ্ধতি (Tandem method)
২. অবাধ ছাটাই পদ্ধতি (Independent Culling method)
৩. বাছাই সূচক পদ্ধতি (Selection Index method)

> কোনো জাতের একাধিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য একক বৈশিষ্ট্য বাছাইয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন করাকে ট্যানডেম পদ্ধতি বলে।

১. ট্যানডেম পদ্ধতি (Tandem method)

কোনো জাতের একাধিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য একক বৈশিষ্ট্য বাছাইয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন করাকে ট্যানডেম পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের সন্তোষজনক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য বাছাই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হয়। একটি বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন হলে তখন অন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এভাবে সবগুলো বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত বাছাই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি প্রথম নির্বাচন করা হয়। যেমন– গাভীর ক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন, উর্বরতা, দুধে সর্বমোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ – এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি প্রথম একক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। যখন সেই বৈশিষ্ট্য কাঙ্খিত স্তরে চলে আসবে তখন অপর বৈশিষ্ট্য একক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

সুবিধা (Advantages)

- উন্নয়নের জন্য বাছাইকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে যখন আকাঙ্খিত কৌলিক অনুবন্ধ (genetic correlation) থাকে তখন এই পদ্ধতিটি বেশি কার্যকরী হয়। কৌলিক অনুবন্ধ হচ্ছে বাছাইয়ের মাধ্যমে একটি বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটানোর সাথে সাথে অন্য বৈশিষ্ট্যতে উন্নয়ন ঘটানো।
- সাধারণত যে সমস্ত দলে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য পালন করা হয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।
- নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অর্থনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে একসাথে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন করা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages)

- কম দক্ষ পদ্ধতি।
- উন্নয়ন করতে খুব বেশি সময় এবং অর্থ লাগে।
- যখন দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৌলিক অনুবন্ধ নেগেটিভ হয় তখন বাছাইএর ফল স্বরূপ একটি বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটলেও অন্য বৈশিষ্ট্যের অবনতি ঘটে।

২. অবাধ ছাটাই পদ্ধতি (Independent Culling method)

অবাধ ছাটাই পদ্ধতিতে একই সময়ে দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতির জন্য বাছাই কাজ চালানো হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য নূন্যতম মান ধার্য করা হয়।

এই পদ্ধতিতে একই সময়ে দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতির জন্য বাছাই কাজ চালানো হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য নূন্যতম মান ধার্য করা হয়। প্রজননের জন্য নির্বাচিত হতে হলে নির্বাচিত পশুকে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ঐ নূন্যতম মান পেতে হয়। কোন একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য যদি পশুটি নূন্যতম মানের চেয়ে কম হয় তবে ঐ পশুকে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা হয় না।

ধরা যাক, দুধ উৎপাদন, দুধ ছাড়াকালীন সময়ে ওজন, এবং প্রথম প্রসবকালীন সময়ে বয়স ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনটি গাভীর মধ্যেই বাছাই কাজ চালানো হবে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ছাঁটাই মাত্রা যথাক্রমে ১.৮ লিটার/দিন, ৬৫ কেজি, এবং ৫৩ মাস দেওয়া আছে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ

গাভী	গড় দুধ উৎপাদন/দিন (কেজি)	দুধ ছাড়াকালীন সময়ে ওজন (কেজি)	প্রথম প্রসবকালীন সময়ে বয়স (মাস)
১	১.৬	৬৫.২	৫৫
২	১.২	৭০.৬	৫৭
৩	১.৯	৬৭.০	৫৩

এখানে আমরা ৩ নং গাভীটিকে বাছাই করব।

সুবিধা (Advantages)

- কোন পশুকে প্রদর্শনীর জন্য তৈরি করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল ফল দেয়। কারণ এক্ষেত্রে পশুকে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য উৎকৃষ্ট হতে হয়।
- একসঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাছাই কার্য চালানো যায়।
- কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য অপ্রাপ্ত বয়সেই ছাটাই করা যায় ফলে খরচ কম হয়।

অসুবিধা (Disadvantages)

এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, একটি প্রাণী একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ভাল দক্ষতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও অন্য বৈশিষ্ট্যের মান ছাটাইমাত্রার নিচে থাকায় ঐ প্রাণীকে ছাটাই করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ২নং গাভীর দুধ ছাড়াকালীন সময়ে ওজন বেশি হওয়া সত্ত্বেও গড় দুধ উৎপাদন ছাটাই মাত্রার নিচে হওয়ায় গাভীটিকে ছাটাই করতে হচ্ছে।

৩. বাছাই সূচক পদ্ধতি (Selection Index method)

বাছাই সূচক পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকরী ও জটিল।

এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকরী ও জটিল। এই পদ্ধতিতে বাছাই এর জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলোর নূন্যতম মান ধরা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের নূন্যতম মানের সাথে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মূল্য গুণ করে ও পরে সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মান যোগ করে ইনডেক্স মান (Index value) বা সূচক বের করা হয়। সাধারণত ইনডেক্স মান বা সূচককে ও দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ইনডেক্স মান দেখে প্রাণীকে বাছাই করা হয় অর্থাৎ যে প্রাণীর ইনডেক্স মান ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য বেশি থাকে তাকে বাছাই করা হয় এবং এভাবে বাছাই কার্য চালিয়ে যাওয়া হয়। তবে বাছাই সূচক পদ্ধতিটি মাংস বা দুধের গরু অপেক্ষা ভেড়া এবং শুকুরের বেলায় বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ধরা যাক, দুধ উৎপাদন, দৈহিক ওজন ও খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য তিনটি গাভীর ইনডেক্স মান বের করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, গাভী তিনটির এই বৈশিষ্ট্যগুলোর নূন্যতম মান ও আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মান নিচে দেওয়া হলো।

গাভী	দুধ উৎপাদন (লিটার)	দৈহিক ওজন (কেজি)	খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা
১	১০	৪০০	৫
২	৮	৭০০	৭
৩	৫	৬০০	৬

আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মান–

দুধ উৎপাদন = ০.৬

দৈহিক ওজন = ০.২

খাদ্য রূপান্ড়রের দক্ষতা = ০.২

সূচক $I = x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 + - - - - - - - - + x_n b_n$

এখানে,

x_1 = দুধ উৎপাদন — b_1 = দুধ উৎপাদনের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মান।

x_2 = দৈহিক ওজন — b_2 = দৈহিক ওজনের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মান।

x_3 = খাদ্য রূপান্ড়রের দক্ষতা — b_3 = খাদ্য রূপান্তর দক্ষতার আপেক্ষিক অর্থনৈতিক মান।

১নং গাভীর ইনডেক্স মান = ১০ × ০.৬ + ৪০০ × ০.২ + ৫ × ০.২
= ৬.০ + ৮০.০ + ১.০
= ৮৭

২নং গাভীর ইনডেক্স মান = ৮ × .৬ + ৭০০ × ০.২ + ৭ × ০.২
= ৪.৮ + ১৪০.০ + ১.৪
= ১৪৬.২

৩নং গাভীর ইনডেক্স মান = ৫ × .৬ + ৬০০ × ০.২ + ৬ × ০.২
= ৩.০ + ১২০.০ +১.২
= ১২৪.২

এখানে ২নং গাভীটিকে বাছাই করা হবে।

সুবিধা (Advantages)

১. সবচেয়ে দক্ষ পদ্ধতি।
২. সময় কম লাগে।
৩. দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন একসঙ্গে করা যায়।
৪. মোট স্কোরের ভিত্তিতে পশু ছাটাই করা যায়।
৫. সকল বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করে সঠিকভাবে যদি কোন ইনডেক্স তৈরি করা হয় তবে তা অধিকতকর সহজ হয়ে থাকে এবং এতে সময় ও প্রচেষ্টা সাপেক্ষে বেশি পরিমাণ কৌলিক উন্নয়ন ঘটে থাকে।

অসুবিধা (Disadvantages)

১. বেশ জটিল পদ্ধতি।
২. একসাথে অধিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নের জন্য বাছাই করতে অনেক সময় অসুবিধা হয়।
৩. এই পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং সঠিকতা নির্ভর করে সঠিকভাবে বাছাই সূচক তৈরির উপর এবং এজন্য প্রজনন কর্মসূচীতে অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন পড়ে।

যে সমস্ত উপাদান পশু প্রজননের জন্য বাছাই করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে, সে উপাদানগুলো হলো বাছাই সাহায্যকারী।

বাছাই সাহায্যকারী (Aids to selection)

যে সমস্ত উপাদান পশু প্রজননের জন্য বাছাই করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে, সে উপাদানগুলো হলো বাছাই সাহায্যকারী। বাছাই এর ক্ষেত্রে যেসব উপাদান অতি প্রয়োজনীয় তা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. সাতন্ত্র্যতা বা বাহ্যিক নমুনা বা সরল ফেনোটাইপিক বাছাই (Individual or Mass or Simple phenotypic selection)
২. সারাজীবনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বাছাই (Lifetime performance records)
৩. বংশবিবরণের ভিত্তিতে বাছাই (Pedigree selection)
৪. পরিবার ভিত্তিতে বাছাই (Family selection)
৫. সন্তান পরীক্ষার ভিত্তিতে বাছাই (Progeny testing)

ভাল জাত উৎপাদন করতে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য পশুর নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে একে প্রজননের জন্য বাছাই করাকে স্বাতন্ত্র্যতা বাছাই বলে।

১. সাতন্ত্র্যতা বা বাহ্যিক নমুনা বা সরল ফেনোটাইপিক বাছাই (Individual or Mass or Simple phenotypic selection)

ভাল জাত উৎপাদন করার জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য পশুর নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে একে প্রজননের জন্য বাছাই করাকে স্বাতন্ত্র্যতা বাছাই বলে। এক্ষেত্রে পশুকে তার নিজস্ব বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাছাই করা হয়। যেমন– দুধ উৎপাদন, দুধে হেপদার্থের শতকরা হার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কোন খামারে যদি ৫০০ গাভী থাকে তবে তাদের দুধ উৎপাদনের রেকর্ড দেখে যাদের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি তাদের বাছাই করা হয়।

একটি প্রাণী তার উৎপাদন দক্ষতার ধারাবাহিকতা কতটুকু বজায় রাখছে তার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের বাছাই করা হয়ে থাকে।

২. সারাজীবনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বাছাই (Lifetime performance records)

একটি প্রাণী তার উৎপাদন দক্ষতার ধারাবাহিকতা কতটুকু বজায় রাখছে তার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের বাছাই করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাভী তার জীবনকালে প্রতি ল্যাকটেশন পিরিয়ডে কী পরিমাণ দুধ উৎপাদন করছে তার উপর নির্ভর করে ঐ গাভীটি বাছাই করা যায়। পরিবেশগত নানাবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উন্নত কৌলিক গুণসম্পন্ন একটি প্রাণীর সারা বছরের গড় উৎপাদন মোটামুটি একই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, উৎকৃষ্ট জাতের একটি দুধালো গাভীকে যদি সঠিক পরিমাণ খাদ্য ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা দেয়া নাও হয়, তবুও ঐ গাভীটি অন্য গাভীর তুলনায় বেশি পরিমাণ দুধ দেবে। সুতরাং একজন প্রজননকারী খুব সহজেই একটি গাভীর উৎপাদন ক্ষমতার তথ্যগুলো দেখে তার ভবিষ্যত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন। কৌলিবিজ্ঞানে, এই বিষয়টিকে বলে "রিপিটেবিলিটি" অর্থাৎ

রিপিটেবিলিটি বলতে বোঝায় একটি প্রাণীর জীবনকালে তার কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের কীভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

৩. বংশ বিবরণের ভিত্তিতে বাছাই (Pedigree selection)

বংশ বিবরণ বলতে কোন পশুপাখির পূর্বপুরুষের রেকর্ডকেই বোঝায়, যার মাধ্যমে ঐ পশুটি তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বংশ বিবরণ বলতে কোন পশুপাখির পূর্বপুরুষের রেকর্ড-কেই বোঝায়, যার মাধ্যমে ঐ পশুটি তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বংশবিবরণ বাছাই এর মূল অবলম্বন না হলেও এটি বাছাই এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হলো প্রতিটি প্রাণী তার পিতা থেকে অর্ধেক এবং মাতা থেকে অর্ধেক বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে। নিম্নোক্ত কারণে আমরা বংশবিবরণের ভিত্তিতে বাছাই এর গুরুত্ব দেই–

- পশুর নিজস্ব গুণাবলী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব হলে।
- কোন পশুকে শৈশবে বাছাই এর ক্ষেত্রে। কারণ অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো পশু কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক হলেই প্রকাশ পায়।
- এই পদ্ধতির ব্যবহার সহজ।
- কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শুধু একলিংগে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অন্য লিংগের প্রাণী বাছাই এর জন্য বংশবিবরণ দেখে বাছাই করা হয়।
- পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা জেনে ঐ স্বতন্ত্র প্রাণীতে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা জানা যায়।

৪. পরিবার ভিত্তিতে বাছাই (Family selection)

এক্ষেত্রে পরিবারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাছাই করা হয়। এই পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোল্ট্রির জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিবার তিন ধরনের হতে পারে–

র) পিতার পরিবার (Sire family)

একটি পিতার সাথে যখন বিভিন্ন মাতার মিলনের ফলে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তখন তাকে পিতার পরিবারের বাচ্চা বলে।

রর) মাতার পরিবার (Dam family)

যখন একটি মাতার সাথে বিভিন্ন পিতার মিলনের ফলে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তখন তাকে গাভীর পরিবারের বাচ্চা বলে।

ররর) পিতা ও মাতার পরিবার (Sire and dam family)

যখন একটি পিতার সাথে একটি মাতার মিলনের ফলে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তখন তাকে পিতা ও মাতার পরিবারের বাচ্চা বলে।

৫. সন্তান পরীক্ষার ভিত্তিতে বাছাই (Progeny testing)

কোনো প্রাণীর বাচ্চার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ প্রাণীর প্রজনন মান নির্ণয় করে বাছাই করার পদ্ধতিকে সন্তান পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই বলে।

কোনো প্রাণীর বাচ্চার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ প্রাণীর প্রজনন মান নির্ণয় করে বাছাই করার পদ্ধতিকে সন্তান পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই বলে।

অথবা অন্য কথায় বিভিন্ন প্রাণীর বাচ্চা পরীক্ষা করার মাধ্যমে সুপিরিয়র বা উৎকৃষ্ট গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং এই ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রজননের উদ্দেশ্যে সুপিরিয়র প্রজনন প্রাণীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

- যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র একটি লিংগে প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে সন্তান পরীক্ষার ভিত্তিতে বাছাই পদ্ধতি উপকারী। যেমন– ডিম উৎপাদন ও দুধ উৎপাদন। পুরুষগুলো যদিও ডিম ও দুধ উৎপাদন করে না কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জিন বহন করে এবং প্রতিটি কন্যা সন্তানে বংশগতির অর্ধেক বহন করে।

- যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য জীবিত প্রাণীতে পরিমাপ করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে সন্তান পরীক্ষার ভিত্তিতে বাছাই পদ্ধতি খুবই উপকারী। যেমন– মাংসের গুণাগুণ।
- দুর্বল বংশগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সমাগম (Mating)

এতোক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম ভবিষ্যত বংশধর তৈরিতে কীভাবে পিতা-মাতা বাছাই করা হবে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কোন্ পদ্ধতিতে এদের মধ্যে মিলন ঘটবে। সারণি ১ এ বিভিন্ন ধরনের প্রজনন পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হলো।

সারণি ১.১ ঃ বিভিন্ন ধরনের প্রজনন পদ্ধতি

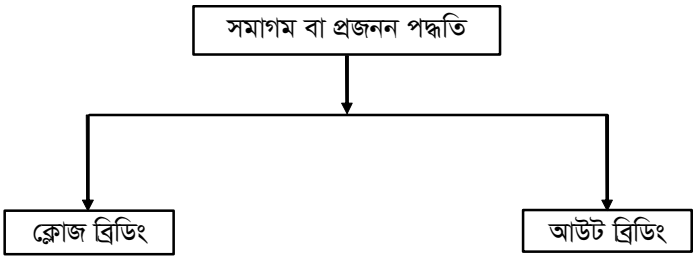

১. ইনব্রিডিং বা আন্তঃ প্রজনন
২. লাইন ব্রিডিং বা সারি প্রজনন

১. ক্রসব্রিডিং বা সংকর প্রজনন
২. আউটক্রসিং বা বহিঃ ক্রসিং
৩. ব্যাকক্রসিং বা পশ্চাৎ ক্রসিং
৪. টপক্রসিং বা শীর্ষ ক্রসিং
৫. গ্রেডিং আপ বা উন্নীতকরণ
৬. ম্যাটিং লাইকস্ বা পছন্দনীয় সংগম
৭. ম্যাটিং আনলাইকস্ বা অপছন্দনীয় সংগম

ক্লোজ ব্রিডিং (Closebreeding)

রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে মিলন ঘটলে তাকে ক্লোজ ব্রিডিং বলে।

ইনব্রিডিং (Inbreeding)

যে পদ্ধতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটো প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বংশধারা ও গুনাবলী অব্যাহত রাখা হয় তাকে ইনব্রিডিং বা আন্তঃ প্রজনন বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রাণী পিতা-মাতা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কযুক্ত। যেমন– আপন ভাই বোন, সৎ ভাই বোন ইত্যাদি।

> যে পদ্ধতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটো প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বংশধারা ও গুনাবলী অব্যাহত রাখা হয় তাকে ইনব্রিডিং বা আন্তঃ প্রজনন বলা হয়।

ইনব্রিডিং এর প্রভাব (Effect of Inbreeding)

- ইনব্রিডিং এর মাধ্যমে কোনো নতুন ধরনের জিনের সৃষ্টি হয় না।
- সাধারণত ইনব্রিডিং এর ফলে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- দীর্ঘ দিন ধরে ইনব্রিডিং করলে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।
- দীর্ঘদিন ধরে ইনব্রিডিং চলতে থাকলে প্রাণীর সজীবতা কমে যায়।
- ইনব্রিডিং এর ফলে বংশানুক্রমিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

একই জাতের উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন দূর সম্পর্কীয় প্রাণীদের মধ্যে যখন প্রজনন ঘটানো হয় তখন তাকে লাইন ব্রিডিং (Line breeding) বলে।

লাইনব্রিডিং (Line breeding)

একই জাতের উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন দূর সম্পর্কীয় প্রাণীদের মধ্যে যখন প্রজনন ঘটানো হয় তখন তাকে লাইন ব্রিডিং (Line breeding) বলে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে চাচাত, মামাত, ফুফাত ভাই বোনদের মাঝে অথবা আরও দূরসম্পর্কীয় প্রাণীদের মাঝে মিলন ঘটানো হয়। উদাহরণসরূপ বলা যায় দাদা-নাতনী অথবা মামাত ভাই ও ফুফাত বোনের মধ্যে যে প্রজনন ঘটে সেটাই লাইনব্রিডিং।

আউটব্রিডিং ইনব্রিডিং এর বিপরীত প্রক্রিয়া।

আউটব্রিডিং (Out breeding)

যে প্রজনন পদ্ধতিতে সম্পর্কহীন বা ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত নয় এমন প্রাণীদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে আউটব্রিডিং (Out breeding) বলে। আউটব্রিডিং ইনব্রিডিং এর বিপরীত প্রক্রিয়া।

সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুটো প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে যে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে ক্রসব্রিডিং বলে।

ক্রসব্রিডিং বা সংকর প্রজনন (Cross breeding)

সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুটো প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে যে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে ক্রসব্রিডিং বলে। ক্রসব্রিডিং দুটো ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত জাতের মধ্যে করা হয়। সাধারণত নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন– জার্সি গাভীর সাথে শাহীওয়াল ষাঁড়ের প্রজনন ঘটিয়ে যদি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয় তবে সেটা হবে ক্রসব্রিডিং।

আউটক্রসিং (Out crossing)

যখন কোনো প্রজননকারী তার খামারের গবাদি পশুর কৌলিক মানে নতুন বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে ষাঁড় নিয়ে এসে প্রজনন ঘটান তখন তাকে আউটক্রসিং বলে।

ব্যাক ক্রসিং বলতে সেই প্রজনন ক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে সন্তানের সাথে পিতা বা মাতা যে কোনো একটির মিলন ঘটানো হয়।

ব্যাক ক্রসিং (Back crossing)

দুটো বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে ক্রসব্রিডিং এর ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি পুনরায় তার মাতা বা পিতার সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটা হবে ব্যাক ক্রসিং। উদাহরণস্বরূপ, জার্সি ও শাহীওয়ালের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি পুনরায় জার্সি বা শাহীওয়ালের সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটাই হবে ব্যাক ক্রসিং।

জার্সি × শাহীওয়াল
↓
সংকর জাত × (জার্সি বা শাহীওয়ালের সাথে)

ক্রিস ক্রসিং (Criss crossing)

ক্রিস ক্রসিং হলো ঐ প্রক্রিয়া যেখানে দুটো বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে প্রথমে একটি বিশুদ্ধ জাতের প্রজনন ঘটাতে হবে এবং এই প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে আবার অপর একটি বিশুদ্ধ জাতের প্রজনন ঘটাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিশুদ্ধ জার্সি ও শাহীওয়াল জাতের প্রজননে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে প্রথমে শাহীওয়াল জাতের মিলন ঘটানো হলো এবং এদের মিলনে উৎপন্ন সংকর জাতের সাথে জার্সি জাতের মিলন ঘটাতে হবে।

জার্সি × শাহীওয়াল
↓
সংকর জাত × শাহীওয়াল
↓
সংকর জাত × জার্সি
↓
সংকর জাত × এভাবে প্রক্রিয়াটি অবিরতভাবে চলতে থাকবে।

ম্যাটিং লাইকস বা পছন্দনীয় সংগম (Mating likes)

এটি যদিও একটি পুরোনো প্রজনন পদ্ধতি তবু বর্তমানেও এর ব্যবহার রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে এ পদ্ধতিতে "ভালোর সাথে ভালো" (best to best) "মধ্যমের সাথে মধ্যম" (average to average) এবং "খারাপের সাথে খারাপ" (worst to worst) এ নীতিতে প্রজনন ঘটানো হয়ে থাকে। কোনো পশু ভালো না মধ্যম না খারাপ তা ঐ পশুটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ম্যাটিং আনলাইকস বা অপছন্দনীয় সংগম (Mating unlikes)

এ ধরনের প্রজনন পদ্ধতিকে ক্ষতিপূরণমূলক প্রজনন (compensatory mating) পদ্ধতি হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। কোনো একটি পশুর যে বৈশিষ্ট্যগুলোর ঘাটতি রয়েছে তা অন্য একটি উৎকৃষ্ট পশু দিয়ে পূরণ করা হয়।

টপ ক্রসিং এবং গ্রেডিং আপ (Grading up)

এ দুটো প্রজনন পদ্ধতি প্রায় একই রকমের। যখন কোনো প্রতিষ্ঠিত জাতের উৎপত্তিস্থল থেকে ষাঁড় বা গাভী এনে ঐ জাতের সাথে প্রজনন করানো হয় তখন তাকে টপক্রসিং বলে। যেমন– মাংস উৎপাদনকারী এ্যাংগাস জাতের উৎপত্তিস্থল হলো স্কটল্যান্ডের পার্থে। যদি আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার কোন অ্যাংগাস জাতের মালিক পার্থ থেকে ষাঁড় এনে প্রজনন করান তবে সেটাই হবে টপক্রসিং। আর গ্রেডিংআপ পদ্ধতিতে উন্নত জাতের বিদেশী ষাঁড় ও দেশী অনুন্নত জাতের গাভীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মিলন ঘটিয়ে উন্নত জাত সৃষ্টি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একটি দেশী গাভীকে একটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করানো হলে যে বাচ্চা জন্ম নেয় তার দেহে ৫০% দেশী ও ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ানের রক্ত থাকে। এ বাছুরকে F_1 ক্রস বলে। এ বাছুর বকনা হলে বড় হওয়ার পর হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড় দিয়ে তাকে প্রজনন করানো হলে বাচ্চার দেহে আদি দেশী মা গাভীর রক্ত আরও অর্ধেক কমে ২৫% হয়ে যাবে। অর্থাৎ এটি ৭৫% উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য পাবে। এটাকে F_2 ক্রস বলে। এভাবে সংকর গাভী থেকে সাত পুরুষে তাত্ত্বিকভাবে প্রায় ১০০% খাটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান আনা যায়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম বংশের গাভী বা ষাঁড়ই ৫০% দেশী ও ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান রক্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

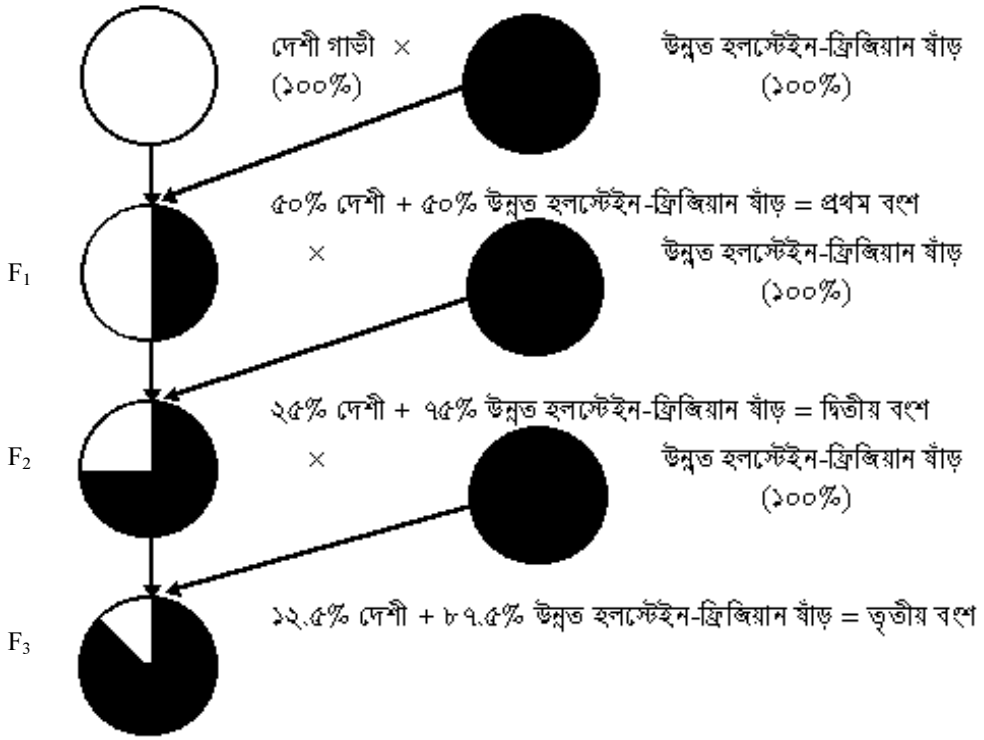

চিত্র ১ ঃ গ্রেডিংআপ এর রেখাচিত্র

বাংলাদেশের গবাদিপশুর উন্নয়নে প্রজনন কর্মসূচী

(Breeding programme for livestock improvement in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে পশুসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পশুসম্পদকে বলা হয় মানুষের খাদ্য যোগানের জৈবিক মেশিন। বাংলাদেশের পশুসম্পদের কৌলিক মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কৌলিক মান নির্ণয়ের জন্য পশুর পরিবেশগত প্রয়োজনগুলো আগে মেটানো দরকার। উপযুক্ত পরিবেশে কৌলিক মান নির্ণয় করা হলে আমাদের দেশেও অনেক ভাল জাতের পশু পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে উন্মুক্ত নিউক্লিয়াস প্রজনন কর্মসূচী (Open Nucleus Breeding System) সংক্ষেপে ONBS হাতে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। বিশ্বের অনেক দেশ এই কর্মসূচী ব্যবহার করে গবাদিপশুর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। যেমন– জার্মানি, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, তানজিনিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান।

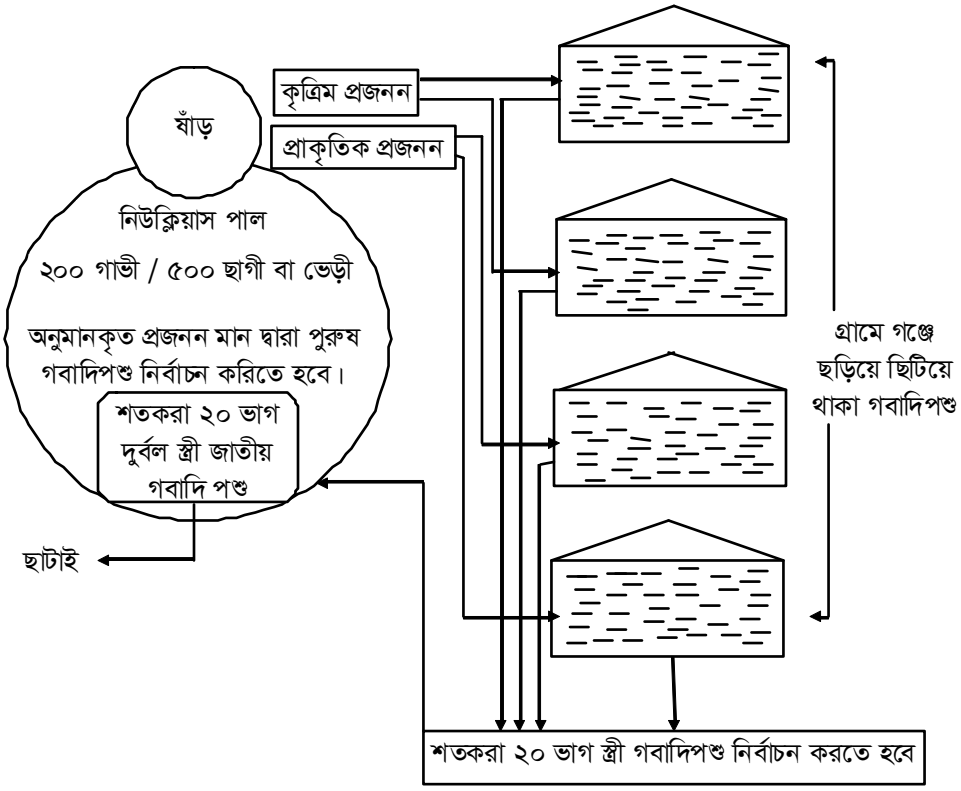

চিত্র ২ ঃ ONBS পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গবাদিপশুর মধ্যে থেকে অধিক উৎপাদনশীল ১০০০ টি গবাদিপশু নির্বাচন করা হয় এবং একটি কেন্দ্রে এনে রাখা হয় অতপর আবারো উৎপাদনের ভিত্তিতে ২০০ টি গাভী বা ৫০০ টি ছাগী বা ভেড়ী নির্বাচন করা হয়। এটিই নিউক্লিয়াস পাল। এই পালের প্রতিটি প্রাণীর বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনুমানকৃত প্রজনন মান (Predicted breeding value) দ্বারা ২০ টি ষাঁড় বা ৫০ টি পাঠা নির্বাচন করে নিউক্লিয়াস পালে সংযোজন করা হয়। অতপর এদের মাঝে প্রজনন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনক্ষম প্রাণীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করা হয় এবং শতকরা ২০ ভাগ নিম্নমানের প্রাণীকে ছাঁটাই করা হয়। নিউক্লিয়াস পালের পুরুষ প্রাণীগুলোকে কৃত্রিম প্রজননের কাজে ব্যবহার করে অথবা প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন কাজে ব্যবহার করে গ্রামের কৃষকদের স্ত্রী প্রাণীগুলোকে পাল দেওয়ানো হয়। ফলে কৃষকের ঘরে যে বাচ্চা উৎপন্ন হবে তা কিছুটা উন্নত মানের হবে। তখন আবার গ্রামীণ কৃষকদের প্রাণীগুলো থেকে ২০%

অধিক উৎপাদনশীল স্ত্রী প্রাণী বাছাই করে নতুন নিউক্লিয়াস পাল তৈরি করা হয়। এভাবে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪-৫ বারে অর্থাৎ ২০-২৫ বছরে উন্নত ও অধিক উৎপাদনক্ষম গবাদিপশু তৈরি করা সম্ভব।

সারমর্ম

জাতের উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গবাদিপশুর কৌলিক মানের উন্নয়ন ঘটানো। বাছাই ও সমাগম হলো পশু প্রজননের দুটো প্রধান হাতিয়ার। ট্যানডেম, অবাধ ছাটাই ও বাছাই সূচক এই তিন ধরনের বাছাই পদ্ধতি রয়েছে। এছাড়া কিছু বাছাই সাহায্যকারী রয়েছে যা বাছাই কার্যক্রমকে সহায়তা করে। প্রজনন কর্মসূচীতে বাছাই এর পরের ধাপই হলো সমাগম পদ্ধতি। আমাদের দেশের গ্রামীন প্রেক্ষাপটে অনুন্নত গবাদিপশুর উন্নয়নে উন্মুক্ত নিউক্লিয়াস প্রজনন কর্মসূচী (Open Nuclurs Breeding System) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাছাই পদ্ধতি কত প্রকার?

i. দুই প্রকার
ii. তিন প্রকার
iii. চার প্রকার
iv. পাঁচ প্রকার

খ. কোন্‌টি বাছাই সাহায্যকারী?

i. ট্যানডেম পদ্ধতি
ii. বাছাই সূচক পদ্ধতি
iii. অবাধ ছাটাই পদ্ধতি
iv. পরিবার ভিত্তিতে বাছাই

২. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাছাই সূচক একটি কার্যকরী ও জটিল পদ্ধতি।
খ. উন্মুক্ত নিউক্লিয়াস প্রজনন কর্মসূচী বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত নয়।

৩. শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে মিলন ঘটলে তাকে - - - - - - - - বলে।
খ. ট্যানডেম পদ্ধতিতে জাতের উন্নয়ন ঘটাতে খুব বেশি - - - - - ও - - - - - লাগে।

৪. এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পশু প্রজননের প্রধান হাতিয়ার কী কী?
খ. কোন্ ধরনের প্রজনন পদ্ধতিতে বিদেশী ষাঁড় ও দেশী অনুন্নত জাতের পর্যায়ক্রমিক মিলন ঘটানো হয়?

পাঠ ১.২ গাভী ও ষাঁড়ের প্রজননতন্ত্র

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ষাঁড়ের জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবেন।
- ষাঁড়ের জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন।
- গাভীর জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- গাভীর জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ষাঁড় ও গাভীর জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।

গবাদিপশুর জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হলে জননতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ পরবর্তী বংশধর বা সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হলে জননতন্ত্র সম্পর্কে জানতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, জননতন্ত্র (Reproductive system) কী? শরীরের যে তন্ত্র বা যে সমস্ত অংগ সম্মিলিতভাবে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের সাথে জড়িত তাকেই জননতন্ত্র বলে।

উর্বর বীর্য বা সিমেন উৎপাদন করাই ষাঁড়ের জননতন্ত্রের প্রধান কাজ।

ষাঁড়ের জননতন্ত্র (Reproductive system of bull)

উর্বর বীর্য বা সিমেন উৎপাদন করাই ষাঁড়ের জননতন্ত্রের প্রধান কাজ। ষাঁড়ের জননতন্ত্র যে অংশগুলো নিয়ে গঠিত সেগুলো হলো–

- অন্ডকোষ বা শুক্রাশয় (Testes)
- এপিডিডাইমিস (Epididymis)
- ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens)
- ইউরেথ্রা (Urethra)
- পুরুষাঙ্গ বা শিশ্ন বা লিঙ্গ বা পেনিস (চবহরং)
- আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহ (Accessory glands)
  - সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vasicle)
  - প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland)
  - বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্রন্থি বা কাউপারস গ্রন্থি (Bulbo urethral glands or cowpers gland)

চিত্র ৩ ঃ একটি ষাঁড়ের জননতন্ত্র

ষাঁড়ের পেছনদিকে দুই উরুর মাঝখানে শুক্রাশয় থলি বা স্ক্রুটাম এর ভেতর দুটো শুক্রাশয় বা অন্ডকোষ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

শুক্রাশয় বা অন্ডকোষ

ষাঁড়ের পেছনদিকে দুই উরুর মাঝখানে শুক্রাশয় থলি বা স্ক্রুটাম এর ভেতর দুটো শুক্রাশয় বা অন্ডকোষ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ষাঁড়ের বয়স ও আকারের উপর শুক্রাশয়ের আকার আকৃতি নির্ভর করে। শুক্রাশয়ের ভেতরে অসংখ্য পেঁচানো নালী রয়েছে যার নাম সেমিনিফেরাস টিউবিউলস। এখান থেকেই শুক্রাণু উৎপাদিত হয়। সেমিনিফেরাস টিউবিউলস এর ফাঁকে ফাঁকে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থাকে যা টেসটোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে। এটিই পুরুষ হরমোন।

কাজ

- শুক্রাণু ও টেসটোস্টেরন হরমোন তৈরি করা।

এপিডিডাইমিস

যে নালীটি শুক্রাশয়ের উপরিভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে এর পাশ বেয়ে নিচে নেমে খানিকটা মোটা হয়ে ভাসডিফারেন্সের সাথে মিশে যায় সেটিই এপিডিডাইমিস। ষাঁড়ের দুটো এপিডিডাইমিস থাকে।

কাজ

- শুক্রাণু স্থানান্তর করা।
- শুক্রাণুর ঘনত্ব বাড়ানো।
- শুক্রাণুর পরিপক্কতা বাড়ানো।
- শুক্রাণু জমা রাখা।

ভাসডিফারেন্স

এপিডিডাইমিসের শেষ অংশ হতে ভাসডিফারেন্স উৎপন্ন হয়। ষাঁড়ে দুটো ভাসডিফারেন্স থাকে।

কাজ

- এপিডিডাইমিস হতে শুক্রাণু মূত্রনালীতে স্থানান্তর করা।

মূত্রনালী

- এটি একটি লম্বা নালী বিশেষ। মূত্রাশয় থেকে আরম্ভ করে পুরুষাঙ্গের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাজ

- শুক্রাণু বের হওয়ার রাস্ড়া হিসেবে কাজ করে।
- আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহ থেকে উৎপন্ন পদার্থগুলো বের হবার রাস্তা হিসেবে কাজ করে।
- মূত্র বের হওয়ার রাস্তা হিসেবে কাজ করে।

আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহ

ষাঁড়ের আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহের মধ্যে রয়েছে দুটো সেমিনাল ভেসিকল, একটি প্রোস্টেট গ্রন্থি ও দুটো কাউপারস গ্রন্থি।

কাজ

- এ গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত আঠালো রস শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে বীর্য বা সিমেনের রূপ ধারণ করে। এছাড়াও বীর্যের যে একটি বিশেষ গন্ধ রয়েছে তা সেমিনাল ভেসিকল থেকেই আসে।

পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ বা শিশ্ন

ষাঁড়ের পুরুষাঙ্গে সিগময়েড ফ্লেক্সার (Sigmoid flexure) নামক ইংরেজি 'S' অক্ষরের ন্যায় একটি বাঁকা এলাকা রয়েছে।

পুরুষাঙ্গ হলো ষাঁড়ের সংগম অঙ্গ। ষাঁড়ের পুরুষাঙ্গে সিগময়েড ফ্লেক্সার (Sigmoid flexure) নামক ইংরেজি 'S' অক্ষরের ন্যায় একটি বাঁকা এলাকা রয়েছে। ষাঁড় উত্তেজিত হলে এই সিগময়েড ফ্লেক্সার সোজা হয়ে পুরুষাঙ্গকে সামনে বাড়িয়ে দেয়। ফলে পুরুষাঙ্গ আচ্ছাদন (Sheath) থেকে বেরিয়ে আসে। আবার বীর্যক্ষরণ শেষ হলে রিট্রাক্টর পেশী (Retractor muscle) পুরুষাঙ্গকে টেনে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

গাভীর জননতন্ত্র (Reproductive system of cow)

গাভীর জননতন্ত্রকে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিষেক, বাচ্চা ধারণ ও প্রসবোত্তর বাচ্চার লালন পালনে ভূমিকা রাখতে হয়।

বীর্য উৎপাদন ও স্থানান্তরের মধ্যেই ষাঁড়ের জননতন্ত্রের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু গাভীর জননতন্ত্রকে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিষেক, বাচ্চা ধারণ ও প্রসবোত্তর বাচ্চার লালন পালনে ভূমিকা রাখতে হয়। গাভীর জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো হলো–

- ডিম্বাশয় (Ovary)
- ডিম্বাশয়নালী (Oviduct)
- জরায়ু (Uterus)
- সার্ভিক্স (Cervix)
- যোনি (Vagina)
- যোনিমুখ (Valva)

চিত্র ৪ ঃ একটি গাভীর জননতন্ত্র

ডিম্বাশয়

গর্ভহীন গাভীর তলপেটের (Abdominal cavity) উপরের অংশে একজোড়া ডিম্বাশয় থাকে।

গর্ভহীন গাভীর তলপেটের (Abdominal cavity) উপরের অংশে একজোড়া ডিম্বাশয় থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় ১.৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ০.৫ ইঞ্চি পুরু হয়ে থাকে। একটি বকনার ডিম্বাশয়ে প্রায় ১ লক্ষ প্রাথমিক ডিম্বাণু বা ওসাইট (Oocyte) থাকে। বকনা বা গাভী গরম হলে সাধারণত একটি পরিপক্ক ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বের হয়ে আসে।

কাজ

- ডিম্বাণু উৎপাদন করা।
- হরমোন, যেমন– ইস্ট্রোজেন নিঃসরণ করা।

ডিম্বাশয়নালী

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের সাথে দুটো প্যাঁচানো নালী রয়েছে এদেরকে ডিম্বাশয়নালী বলে।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের সাথে দুটো প্যাঁচানো নালী রয়েছে এদেরকে ডিম্বাশয়নালী বলে। এ নালীর যে অংশ ডিম্বাশয়ের দিকে থাকে সেখানে ফানেল আকৃতির উপাঙ্গ থাকে যাকে ইনফান্ডিবুলাম বলে। গাভীর একটি ডিম্বাশয় নালী ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা হয়।

কাজ

- ডিম্বাশয় থেকে বের হয়ে আসা ডিম্বাণু ইনফান্ডিবুলাম গ্রহণ করে।
- ডিম্বাশয়নালীতে নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

জরায়ু

নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর ভ্রুণ জরায়ুতে অবস্থান করে এবং এখানেই বৃদ্ধিলাভ করে।

নিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর ভ্রুণ জরায়ুতে অবস্থান করে এবং এখানেই বৃদ্ধিলাভ করে। জরায়ু দুটো অংশে বিভক্ত–

ক. জরায়ুর শরীর (Body of uterus)

খ. জরায়ুর শাখা (Horns of uterus)

- ডান শাখা (Right horn)
- বাম শাখা (Left horn)

কাজ

- জরায়ুর শাখাতে ভ্রুণ বৃদ্ধিলাভ করে।
- করপাস লিউটিয়ামের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
- মলদ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জরায়ু অনুভব করে গর্ভধারণ নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা করা যায়।

সার্ভিক্স

যোনি ও জরায়ুর মাঝখানে ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা কিছুটা শক্ত অংশ রয়েছে, যা সার্ভিক্স নামে পরিচিত।

যোনি ও জরায়ুর মাঝখানে ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা কিছুটা শক্ত অংশ রয়েছে, যা সার্ভিক্স নামে পরিচিত। শুধুমাত্র প্রসবকালীন ও গরম হওয়ার সময়ে সার্ভিক্স খোলা থাকে। এছাড়া অন্য সময় সার্ভিক্স বন্ধ থাকে।

কাজ

- জরায়ুকে বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং জরায়ুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

যোনি

যোনি হচ্ছে গাভীর সঙ্গম অঙ্গ। যোনিমুখ এবং সার্ভিক্সের মাঝখানে যোনি আবস্থিত।

যোনি হচ্ছে গাভীর সঙ্গম অঙ্গ। যোনিমুখ এবং সার্ভিক্সের মাঝখানে যোনি আবস্থিত। যোনির ভেতরের অংশ অমসৃণ।

কাজ

- সংগমের সময় ষাঁড় এখানেই বীর্যপাত ঘটায়।
- এই যোনি দিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়।

যোনিমুখ

গাভীর জননতন্ত্রের সবচেয়ে বাইরের অংশ। মলদ্বারের নিচেই যোনিমুখের অবস্থান।

কাজ

- ষাঁড় যোনিমুখ দিয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায়।
- প্রসবের সময় এই পথেই বাচ্চা বের হয়ে আসে।

সারমর্ম

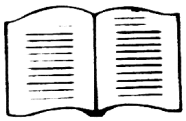

শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস, ভাসডিফারেন্স, ইউরেথ্রা, পুরুষাঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক গ্রন্থিসমূহের সমন্বয়ে ষাঁড়ের প্রজননতন্ত্র গঠিত। ষাঁড়ের প্রজননতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো বীর্য বা সিমেন উৎপাদন করা এবং তা স্থানান্তর করা। গাভীর জননতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো ডিম্বাশয়নালী, জরায়ু, সার্ভিক্স, যোনি ও যোনিমুখ। যোনি দিয়ে ষাঁড়ের বীর্য গাভীর জননতন্ত্রে প্রবেশ করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে উৎপন্ন ভ্রুন জরায়ুর শাখাতে অবস্থান করে এবং বৃদ্ধি লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোনটি ষাঁড়ের আনুষাঙ্গিক গ্রন্থি নয়?

i. সেমিনাল ভেসিকল
ii. প্রোস্টেট গ্রন্থি
iii. ইউরেথ্রা
iv. কাউপারস গ্রন্থি

খ. ডিম্বাশয়নালী কতটুকু লম্বা হয়?

i. ৮-১০ ইঞ্চি
ii. ৮-১২ ইঞ্চি
iii. ৯-১০ ইঞ্চি
iv. ১০-১২ ইঞ্চি

২. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সার্ভিক্স জরায়ুকে বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
খ. ভাসডিফারেন্স গাভীর জননতন্ত্রের একটি অংশ।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. যোনি ও জরায়ুর মাঝখানে - - - - - - অবস্থিত।
খ. - - - - - - পেশী পুরুষাঙ্গকে টেনে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

৪. এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. শুক্রাশয় থেকে প্রধানত কী তৈরি হয়?
খ. ইস্ট্রোজেন হরমোন কোথায় উৎপন্ন হয়?

পাঠ ১.৩ বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র, গরম হওয়ার লক্ষণ ও করণীয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঋতুচক্র কী তা বলতে পারবেন।
- ঋতুচক্রের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বকনা বা গাভীর ঋতুচক্রের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবেন।
- বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বকনা বা গাভী গরম হওয়ার পর কী করতে হবে তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর (Sexual maturity) স্ত্রী জাতীয় গবাদিপশু হঠাৎ করে একদিন কামোদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এই কামোদ্দীপনাকেই আমরা 'গরম হওয়া' বা ডাকে আসা এস্ট্রাস (Estrous) নামে অভিহিত করে থাকি।

বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র (Estrous cycle of heifer or cow)

বয়ঃপ্রাপ্তির পর (Sexual maturity) বকনা বা গাভী জাতীয় গবাদিপশু হঠাৎ করে একদিন কামোদ্দীপ্ত হয়ে উঠে অর্থাৎ ষাঁড়ের সাথে মিলিত হবার ইচছা প্রকাশ করে। এই কামোদ্দীপনাকেই আমরা 'গরম হওয়া' বা ডাকে আসা এস্ট্রাস (Estrous) নামে অভিহিত করে থাকি। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যা বকনা বা গাভীর প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমিকভাবে শারীরবৃত্তীয় ও আকৃতিগত পরিবর্তন আনে। এই সাময়িক পরিবর্তনগুলো পরবর্তীতে গরম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং এই সময়কালকেই ঋতুচক্র (Estrous cycle) বলে। তবে গরম হওয়ার পর ষাঁড়ের সাথে মিলনের ফলে যদি গর্ভবতী হয় তবে বাচ্চা প্রসবের পূর্ব পনন্ত বকনা বা গাভী আর গরম হয় না।

ঋতুচক্রের বিভিন্ন ধাপ (Different phase of estrous cycle)

বিজ্ঞানী মার্শাল ঋতুচক্রকে চারটি ধাপে ভাগ করেছেন

প্রোএস্ট্রাস

করপাস লিউটিয়াম ক্ষয় হতে শুরু করে এবং পুনরায় এস্ট্রাস ধাপ না আসা পর্যন্ত চলতে থাকে।

এস্ট্রাস

এই ধাপে বকনা বা গাভী ষাঁড়ের সাথে মিলিত হবার তীব্র আকাংখা প্রকাশ করে।

মেটএস্ট্রাস

এস্ট্রাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই ধাপ শুরু হয় এবং এই ধাপে ওভারীতে করপাস লিউটিয়াম তৈরি শুরু হয়।

ডাই এস্ট্রাস

এই ধাপে কর্পাস লিউটিয়াম পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হয়। এটি ঋতুচক্রের সবচেয়ে বড়ো ধাপ। তবে বকনা বা গাভী যদি ষাঁড়ের সাথে মিলিত হয় এবং মিলনের ফলে গর্ভধারণ করে তবে বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত এই ধাপটি চলতে থাকে।

তবে বর্তমানে ঋতুচক্রকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে

১. **ফলিকুলার ধাপ ঃ** প্রোএস্ট্রাস ও এস্ট্রাস এধাপের অন্তর্গত।
২. **লিউটিয়াল ধাপ ঃ** মেটএস্ট্রাস ও ডাইএস্ট্রাস ধাপকে এ ধাপে নিয়ে আসা হয়েছে।

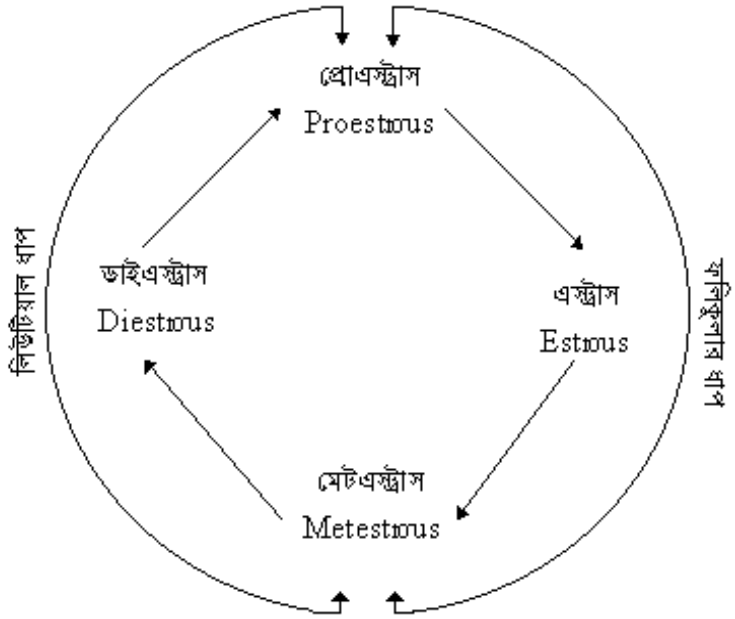

চিত্র ৫ ঃ ঋতুচক্রের বিভিন্ন ধাপ

বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র (Estrous cycle of heifer or cow)

- ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য ঃ ২০-২২ দিন (গড়ে ২১ দিন)
- এস্ট্রাসের স্থায়ীত্বকাল ঃ ১২-২৪ ঘন্টা (গড়ে ১৮ ঘন্টা)
- মেটএস্ট্রাসের স্থায়ীত্বকাল ঃ ৩ দিন
- ডাইএস্ট্রাসের স্থায়ীত্বকাল ঃ ঋতুচক্রের ৫ম দিন থেকে ১৭তম দিন পর্যন্ত।
- প্রোএস্ট্রাস ঃ ১৮তম দিন থেকে এস্ট্রাস না আসা পর্যন্ত।
- লিউটিয়াল ধাপ ঃ ১৭-১৮ দিন
- ফলিকুলার ধাপ ঃ ৩-৪ দিন
- ওভুলেশন বা ডিম্বস্থলনের সময় ঃ এস্ট্রাস শুরু হওয়ার ১০-১২ ঘন্টা পর।

বকনা বা গাভী গরম হলে বিভিন্ন ধরনের স্বভাবগত ও শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ ও পরিবর্তন দেখা দেয়।

বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণ (Symptoms during estrous of cow)

বকনা বা গাভী গরম হলে বিভিন্ন ধরনের স্বভাবগত ও শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ ও পরিবর্তন দেখা দেয়।

এগুলো হলো Ñ

- বকনা বা গাভী অশান্ত থাকবে এবং একজায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে।
- গরম হওয়ার শুরুতে নিজে অন্য পশুর উপর লাফ দিবে এবং পুরোপুরি গরম অবস্থায় অন্য পশুকে নিজের উপর লাফ দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।
- অন্য পশুকে নিজের পশ্চাৎদেশ চাটতে দিবে।
- দুধালো গাভীর ক্ষেত্রে হঠাৎ করে দুধ দেয়া কমে যাবে।
- খাওয়ার আগ্রহ কমে যাবে।
- বকনা বা গাভীকে খুবই সতর্ক মনে হবে এবং সবসময় কান খাড়া করে থাকবে।
- ঘনঘন অল্প পরিমাণে প্রস্রাব ও পায়খানা করবে।
- লেজ নাড়াতে থাকবে।

- যোনি পথ (vagina) দিয়ে স্বচ্ছ মিউকাস বা শে- ষ্মা বের হবে।
- হাত দিয়ে যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করলে ভেতরটা অন্য সময়ের চেয়ে বেশি লালচে দেখাবে।
- স্পেকুলামের সাহায্যে সার্ভিক্সের (cervix) মুখ দেখলে মনে হবে সার্ভিক্স খোলা রয়েছে।
- বকনা বা গাভী হাম্বা হাম্বা করে অনবরত ডাকতে থাকবে।
- শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যাবে।
- রক্তে প্রথমে ইস্ট্রোজেন ও পরে লিউটিনাইজিং হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাবে।

বকনা বা গাভী গরম হওয়ার পর করণীয় (Activities during estrous)

বকনা বা গাভীর গরম অবস্থায় প্রধান কাজ হলো পাল দেওয়ানো। এজন্য প্রথমেই পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ণয় করতে হবে।

বকনা বা গাভীর গরম অবস্থা শুরু হওয়ার ১২ ঘন্টার পর পাল দিলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

সাধারণত গাভী গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর থেকে পরবর্তী ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলেই চলে। কিন্তু ভালো ফলাফল পাবার জন্য চিত্র ৬ এ প্রদর্শিত সময় অনুযায়ী পাল দিতে হবে। চিত্র ৬ অনুযায়ী এস্ট্রাস ধাপ শুরু হওয়ার ৮ ঘন্টা পর গাভীতে গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত গরম অবস্থা স্থায়ী থাকে। এরপর থেকে গরম অবস্থা চলে যেতে থাকে। গরম অবস্থায় আসার শুরু থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে সফলতার হার হবে শতকরা ৪৫ থেকে ৭০ ভাগ। আর ৭ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে শতকরা ৭০ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত সফলতা পাওয়া যাবে। তবে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে ১২ ঘন্টার সময় পাল দিলে। ১৮ ঘন্টার পর পাল দিলে ক্রমান্বয়ে সফলতার হার কমতে থাকবে।

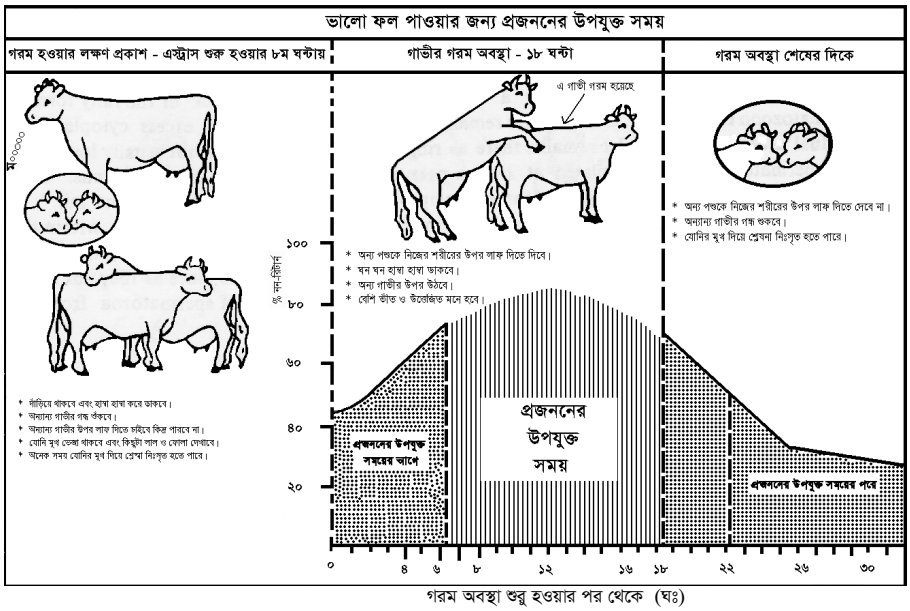

চিত্র ৬ ঃ পাল দেওয়ার সময়

পাল দেওয়ার দুটো পদ্ধতি রয়েছে Ñ

১. **প্রাকৃতিক পদ্ধতি ঃ** বকনা বা গাভীর সংগে প্রজননক্ষম ষাঁড়ের মিলনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

২. কৃত্রিম পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে ষাঁড়ের বীর্য বকনা বা গাভীর জননতন্ত্রে প্রবেশ করানো হয়। বকনা বা গাভীর ক্ষেত্রে মলদ্বার যোনি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সারমর্ম

বকনা বা গাভীর ষাঁড়ের সাথে মিলিত হবার ইচ্ছাকেই গরম হওয়া বা ডাকে আসা বা এস্ট্রাস (Estrous) বলে। পরপর দুটো গরম হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুই হচ্ছে ঋতুচক্র (Estrous cycle)। বকনা বা গাভীর ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য ২০-২২ দিন। বর্তমানে বকনা বা গাভীর ঋতুচক্রকে ফলিকুলার ও লিউটিয়াল এই দুই ধাপে ভাগ করা হয়। গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর পরবর্তী ৬ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে বকনা বা গাভীকে পাল দেওয়ানো উচিত। বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার স্থায়ীত্বকাল হলো ১২ থেকে ২৪ ঘন্টা। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এই দুপদ্ধতিতে বকনা বা গাভীকে পাল দেওয়ানো হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বকনা বা গাভীর এস্ট্রাসের স্থায়ীত্বকাল কত ঘন্টা?

i. ১২ - ২৪ ঘন্টা
ii. ১০ - ২৬ ঘন্টা
iii. ১২ - ২৬ ঘন্টা
iv. ১৬ - ২৪ ঘন্টা

খ. বিজ্ঞানী মার্শাল ঋতুচক্রকে কয়টি ধাপে ভাগ করেছেন?

i. ২ টি
ii. ৩ টি
iii. ৪ টি
iv. ৫ টি

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ডাইএস্ট্রাস ধাপে বকনা বা গাভী ষাঁড়ের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।
খ. গরম অবস্থায় দুধালো গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বর্তমানে ঋতুচক্রকে ফলিকুলার ও - - - - - - ধাপে ভাগ করা হয়।
খ. এস্ট্রাস শুরু হওয়ার - - - - - - - ঘন্টার পর ওভুলেশন বা ডিম্বস্খলন হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বকনা বা গাভীর ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য কত?
খ. গাভী গরম হওয়ার কত সময়ের মধ্যে পাল দিতে হয়?

পাঠ ১.৪ কৃত্রিম প্রজনন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কৃত্রিম প্রজনন কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাভী থেকে কীভাবে বীর্য সংগ্রহ করা হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কীভাবে বীর্য মূল্যায়ন করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃত্রিম প্রজনন (Artificial insemination)

গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের (Genetic improvement) জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ষাঁড় ব্যবহার করে বহুসংখ্যক গাভীকে পাল দেওয়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বহুলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কৃত্রিম প্রজননের আদিকথা (History of artificial insemination)

খ্রীষ্টের জন্মের ১৩০০ বছর পূর্বে একজন আরব বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ঘোড়ীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারণ ঘটাতে সক্ষম হন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টের জন্মের ১৩০০ বছর পূর্বে একজন আরব বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ঘোড়ীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারণ ঘটাতে সক্ষম হন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম প্রজননে প্রথম সফলতা লাভ করেন ইটালির বিজ্ঞানী স্পেলেনজানি ১৭৮০ সালে। তিনি সাফল্যজনকভাবে কুকুরীতে কৃত্রিম প্রজনন করেন। ১৯২৮ সাল থেকে রাশিয়াতে ব্যাপকভাবে গাভীতে কৃত্রিম প্রজনন প্রয়োগ শুরু হয়। পাকভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালে মহিশুর দুগ্ধ খামারে কৃত্রিম প্রজনন শুরু হয়। স্বাধীনতা পূর্ব পঞ্চাশ-এর দশকে এদেশে সরকারীভাবে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

কৃত্রিম প্রজনন কী?

কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে–

- কৃত্রিমভাবে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়।
- সংগৃহীত বীর্যের গুণাগুন পরীক্ষা করা হয়।
- বীর্যকে তরল করা হয় এবং
- যান্ত্রিক উপায়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীর্য প্রবেশ করানো হয়।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা (Advantages of artificial insemination)

- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ভালো গুণাবলী সম্পন্ন উন্নত ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করে গাভীকে পাল দেওয়া যায় এবং এভাবে জাতের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।
- প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ষাঁড় বছরে ৫০টি গাভীর সাথে মিলিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের বেলায় ঐ ষাঁড়ের বীর্য দিয়ে বছরে কমপক্ষে ১০০০০ গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব হয়।
- উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীর্য সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়।

বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড় আমদানি না করেও শুধুমাত্র বীর্য আমদানি করে দেশী অনুন্নত জাতের গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব হয়।

- বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড় আমদানি না করেও শুধুমাত্র বীর্য আমদানি করে দেশী অনুন্নত জাতের গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব হয়।
- অনেক সময় বড়ো আকারের ষাঁড় দিয়ে ছোট আকারের গাভীকে প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়া অসুবিধা হয়ে পড়ে। কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়।
- একস্থান থেকে অন্যস্থানে গাভী বা ষাঁড় পরিবহণের খরচ এবং ঝামেলা পোহাতে হয় না।

- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ষাঁড় থেকে গাভীতে সংক্রামক রোগ (যেমন– ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি) বিস্তার প্রতিহত করা যায়।
- গাভীতে বীর্য প্রবেশ করানোর পূর্বে বীর্যের গুণাবলী পরীক্ষা করে দেখা হয় বলে গাভীর গর্ভধারণের সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা (Disadvantages of artificial insemination)

- দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপারেটর এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।
- প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়ার চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।
- যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিষ্কার করা না হলে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকলে গাভীর গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যায়।

বীর্য সংগ্রহ (Collection of Semen)

ভালো মানের বীর্য পেতে হলে উন্নত জাতের ষাঁড় বাছাই করার পাশাপাশি ষাঁড়কে সঠিক পরিমাণে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, আরামদায়ক বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে, নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস করাতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে বীর্য সংগ্রহ করতে হবে।

বীর্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Semen collection methods)

কৃত্রিম উপায়ে বীর্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- কৃত্রিম যোনি পদ্ধতি (Artificial vagina method)
- বৈদ্যুতিক বীর্যক্ষরণ পদ্ধতি (Electro ejaculate method)
- মৈথুন পদ্ধতি (Massage method)

কৃত্রিম উপায়ে ষাঁড় হতে বীর্য সংগ্রহের জন্য এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

কৃত্রিম যোনি পদ্ধতি (Artificial vagina method)

কৃত্রিম উপায়ে ষাঁড় হতে বীর্য সংগ্রহের জন্য কৃত্রিম যোনি পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এটি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে একটি যোনি তৈরি করা হয়, যেখানে তাপ ও চাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যা গাভীর যোনির মতোই মনে হয়।

চিত্র ৭ ঃ কৃত্রিম যোনির বিভিন্ন অংশ

কৃত্রিম যোনি প্রস্তুতকরণ

কৃত্রিম যোনি প্রস্তুত করার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেয়া যাক। যে অংশগুলোর সমন্বয়ে একটি কৃত্রিম যোনি তৈরি করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো–

- রাবার সিলিন্ডার (২-৩" ব্যাস, দৈর্ঘ্য ১৪-১৮")
- রাবার ইনার লাইনার
- রাবার কোণ
- দাগকাটা সংগ্রাহক নল
- প্রটেকটিব টিউব
- থার্মোমিটার
- রড ও পাম্পার
- ভ্যাসেলিন বা কে.ওয়াই জেলী ইত্যাদি

কৃত্রিম যোনি প্রস্তুতকরণের ধাপ

- প্রথমে ইনারলাইনারটি রাবার সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দুই প্রান্ত ভালোভাবে আটকিয়ে দিতে হবে।
- এবার রাবার বন্ধনী দ্বারা সিলিন্ডারের পেছন দিকে রাবার কোণটি আটকিয়ে দিন। রাবার কোণের পেছনে সংগ্রাহকনল লাগিয়ে দিতে হবে।
- এখন ৪৩-৪৫° সে. (১১০-১১৫° ফাঃ) তাপমাত্রার গরম পানি দিয়ে রাবার সিলিন্ডার ও ইনার রাবার লাইনের মধ্যবর্তী স্থানের দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি করতে হবে।
- এবার পাম্পার দিয়ে পাম্প করে সিলিন্ডার ও লাইনারের মধ্যবর্তীস্থান ফুলিয়ে নিতে হবে।
- ভেসলিন বা কে.ওয়াই জেলী কাঁচের নল দিয়ে কৃত্রিম যোনির মুখের ফাঁকা জায়গায় মেখে নিতে হবে।
- এবার থার্মোমিটারের সাহায্যে কৃত্রিম যোনির তাপমাত্রা ৪৩-৪৫° সে. এর মধ্যে আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। কৃত্রিম যোনির বিভিন্ন অংশগুলো সংযোজনের পূর্বে সেগুলো অবশ্যই পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

ষাঁড়ের যত্ন ও প্রস্তুতি (Care and preparation of bull)

কৃত্রিম উপায়ে বীর্য সংগ্রহের পূর্বে এবং সংগ্রহের সময় ষাঁড়ের যত্ন ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো হলো–

> কৃত্রিম উপায়ে বীর্য সংগ্রহের পুর্বে এবং সংগ্রহের সময় ষাঁড়ের যত্ন ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

পরিচছন্নতা (Cleanliness)

- ষাঁড় অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে।
- বীর্য সংগ্রহের কয়েক মিনিট পূর্বে ব্রাশ দিয়ে গ্রুমিং করে নিতে হবে।
- পেনিসের সিথের মধ্যকার লম্বা চুল কেটে ফেলতে হবে।
- সিথের নিচের অংশ ভেজা তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
- বেশি ময়লা থাকলে সিথ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

বীর্য সংগ্রহপূর্বক উত্তেজনা (Precollection sex stimulation)

- বীর্য সংগ্রহের পূর্বে ডামি ব্যবহার করে ষাঁড়ের উত্তেজনা বাড়াতে হবে।

উত্তেজনা ধরে রাখা (Maintaining sex drive)

- ষাঁড়ের উত্তেজনা মুহূর্তে ভুল ব্যবস্থাপনা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- বীর্য সংগ্রহকারীকে যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করতে হবে।
- বীর্য সংগ্রহের সময় উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বীর্য সংগ্রহের সময় করণীয়

বীর্য সংগ্রহের সময় বীর্য সংগ্রহকারীকে অবশ্যই কৃত্রিম যোনির তাপমাত্রা সঠিক আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।

- বীর্য সংগ্রহের সময় বীর্য সংগ্রহকারীকে অবশ্যই কৃত্রিম যোনির তাপমাত্রা সঠিক আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।
- কখনো সিথসহ পেনিস যোনির ভেতরে প্রবেশ করানো যাবে না।
- কৃত্রিম যোনি অবশ্যই পেনিসের সমান্তরালে রাখতে হবে।
- পেনিস কখনো বেশি নিচু করা যাবে না এতে বীর্য সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে।
- বীর্য সংগ্রহকারীকে ষাঁড়ের আচরণ সমন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।
- যোনির ভেতর পেনিসকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে ষাঁড় যোনির ভেতর বীর্য নির্গত করতে পারে।
- বীর্য সংগ্রহের সাথে সাথে সিমেন ভায়াল সরিয়ে নিতে হবে এবং তা ২৮-৩০° সে. তাপমাত্রায় ওয়াটার বাথে রেখে দিতে হবে।

বীর্য সংগ্রহের হার

- চার থেকে পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করলে বীর্যের আয়তন তথা বীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রানুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বীর্যের মূল্যায়ন

কৃত্রিম উপায়ে সংগৃহীত বীর্য ব্যবহারের পূর্বে কতকগুলো ধারাবাহিক পরীক্ষা করা হয়। এ সকল পরীক্ষার মাধ্যমে বীর্যের গুণগতমান ও উর্বরতার ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়। একেই বীর্যের মূল্যায়ন বলে।

কৃত্রিম উপায়ে সংগৃহীত বীর্য ব্যবহারের পূর্বে কতকগুলো ধারাবাহিক পরীক্ষা করা হয়। এ সকল পরীক্ষার মাধ্যমে বীর্যের গুণগতমান ও উর্বরতার ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়। একেই বীর্যের মূল্যায়ন বলে। সংগৃহীত বীর্য কৃত্রিম প্রজননের জন্য উপযোগী কিনা তা বীর্যের মূল্যায়নের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব। বীর্যকে কতগুণ তরলীকরণ করা যাবে সেটাও মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

ম্যাক্রোস্কোপিক ও ভৌত পরীক্ষা

সংগ্রাহক নলের সাহায্যে বীর্যের আয়তন সরাসরি পরিমাপ করা হয়।

আয়তন ঃ সংগ্রাহক নলের সাহায্যে বীর্যের আয়তন সরাসরি পরিমাপ করা হয়। একটি ষাঁড় থেকে প্রতিবারে গড়ে ৫-৮ সি.সি. বীর্য পাওয়া যায়।

বর্ণ ঃ বীর্যের বর্ণ সাধারনত ক্রীম, ধুসর বা হলুদাভ হয়ে থাকে। এর বাইরে কোনো রং যেমন– খুব হলুদ যা পূঁজ বা প্রসাব মেশানো বীর্য, লালচে যা রক্ত মেশানো বীর্য নির্দেশ করে।

বীর্যের ঘনত্ব ঃ একটি সুস্থ ও সবল ষাঁড়ের বীর্যের ঘনত্ব ক্রীমের মতো হয়ে থাকে। অপরদিকে দুর্বল বা অসুস্থ ষাঁড়ের বীর্য পানির মতো তরল যা ব্যবহারের উপযোগী নয়।
সান্দ্রতা ঃ বীর্যের সান্দ্রতা সংগ্রাহক নল আলতোভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষা

বীর্যের নড়াচড়ার গতি পরীক্ষা (Motility of Spermatozoa) ঃ বীর্য সংগ্রহের অল্প সময় পরে একটি পরিস্কার পাইডে এক ফোটা বীর্য নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বীর্যের নড়াচড়ার গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বীর্যের নড়াচড়ার গতিকে ০-৫ পর্যন্ত গ্রেডে ভাগ করা যায়।

০ = এই গ্রেড বীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রাণুর কোনোরূপ নড়াচড়া নির্দেশ করে না অর্থাৎ ঘড় motility।

+ = এই গ্রেড বীর্যের মধ্যকার শতকরা ২০ ভাগের কম শুক্রাণুর নড়াচড়া নির্দেশ করে। অবশ্য এতে বীর্যের অগ্রগামী গতি পরিলক্ষিত হয় না। এটা Poor motility।

++ = শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ শুক্রাণুর নড়াচড়া এ গ্রেডে পরিলক্ষিত হয়। এটা Good motility।

+++ = প্রায় শতকরা ৫০-৭৫ ভাগ শুক্রাণু নড়াচড়া করে। এতে শুক্রাণুগুলো সক্রিয় থাকে এবং অগ্রগামী গতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গতি খুব দ্রুত হয় না। এটি Very good motility।

++++ = এই গ্রেডের বীর্যের শতকরা ৮০ বা ততোধিক শুক্রাণু খুবই তড়িৎ গতি সম্পন্ন এবং এদের অগ্রগামী গতি এতো দ্রুত হয় যে কোনো একটি শুক্রাণু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। এটা Excellent motility।

+++ = এ মান অথবা তার চেয়ে ভালমানের বীর্য কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করতে হবে।

বীর্যের মধ্যে কোনোক্রমেই শতকরা ২০ ভাগের বেশি অস্বাভাবিক আকৃতির শুক্রাণু থাকা উচিৎ নয়।

অস্বাভাবিক আকৃতির শুক্রাণুর হার

বীর্যের মধ্যে কোনোক্রমেই শতকরা ২০ ভাগের বেশি অস্বাভাবিক আকৃতির শুক্রাণু থাকা উচিত নয়। শুক্রাণুর আকৃতিতে যে অস্বাভাবিকতা গুলো দেখা যায়, সেগুলো হলো–

মাথা ঃ দ্বৈত মাথা, লম্বা মাথা, ক্ষুদ্র মাথা, সরু মাথা।

লেজ ঃ সরু লেজ, মাঝখানে ভাঙ্গা লেজ, ইত্যাদি।

ঘাড় ঃ মাথার সাথে ভালো সংযোগের অনুপস্থিতি,

মধ্যভাগ ঃ বর্ধিত, সরু ইত্যাদি।

রাসায়নিক পরীক্ষা

পি.এইচ (pH) ঃ নাইট্রাজেন কাগজ দিয়ে এই পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। বীর্যের pH ষাঁড়ের ক্ষেত্রে ৬-৭ এর মধ্যে অবস্থান করে।

মিথাইলিন-ব্লু-পরীক্ষা ঃ এ পরীক্ষায় বীর্য প্রক্রিয়াজাত করে মিথাইলিন ব্লু মিশিয়ে ১১০-১১৫° ফা. (৪৩-৪৬° সে.) তাপে নলের মধ্যে পানিতে রাখা হয়। ৩-৬ মিনিটের মধ্যে যদি বীর্যের নীল রং চলে যায়, তবে এটি ভালো মানের বীর্য, অন্যদিকে যদি নীল রং বিবর্ন হতে ৯ মিনিটের বেশি সময় নেয় তবে উক্ত বীর্য ব্যবহারের অনুপুযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

বীর্য তরলীকরণ ও সংরক্ষণ

বীর্যের আয়তন এবং শুক্রাণুর বেঁচে থাকার সময়কাল বৃদ্ধির জন্য বীর্য তরলীকরণ অপরিহার্য। কৃত্রিম উপায়ে বীর্য সংগ্রহ করে তা তরলীকরণের মাধ্যমে অসংখ্য গাভীকে পাল দেওয়া যায়। এতে করে ভালো জাতের গবাদিপশুর উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। বীর্যের আয়তন বাড়ানোর জন্য যে মিডিয়া ব্যবহার করা হয় তাকে ডাইলুয়েন্ট বলে। যেমন– এগ ইয়ক সাইট্রেট একটি বহুল ব্যবহৃত ডাইলুয়েন্ট। বীর্য তরলীকরণে ব্যবহৃত ডাইলুয়েন্টের (diluent) নিচের বৈশিষ্টগুলো থাকতে হবে।

- রাসায়নিক দিক থেকে ডাইলুয়েন্ট বিষাক্ত হবে না।
- ডাইলুয়েন্ট শুক্রাণুর জন্য শক্তি সরবরাহকারী খাদ্যোপাদানযুক্ত হবে।
- ঠান্ডা থেকে শুক্রাণু রক্ষা পাবে এমন গুণসম্পন্ন হতে হবে।
- ডাইলুয়েন্ট অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব মুক্ত হবে।
- সম্পূর্ণভাবে জীবানুমুক্ত হতে হবে।

ডাইলুয়েন্টের প্রকার

- এগইয়ক সাইট্রেট এক্সটেনডার
- মিল্ক এক্সটেনডার
- এগইয়ক ফসফেট ডাইলুয়েন্ট
- মিল্ক-রিপ্লেসার
- কোকোনাট মিল্ক এক্সটেনডার

এগইয়ক সাইট্রেট ডাইলুয়েন্ট তৈরির ধাপ

বাফার তৈরি

১০০ সি.সি. বিশুদ্ধ পানির সঙ্গে ২.৯৪ গ্রাম সোডিয়াম সাইট্রেট পাউডার মিশ্রিত করে সোডিয়াম সাইট্রেট বাফার তৈরি করা হয়।

এন্টিবায়োটিক যোগকরণ

- পেনিসিলিন ৫ লক্ষ আই ইউ এম্পুল ৫ সি.সি. পানি দ্রবীভূত করে তার ১ সি.সি. ১০০ সি.সি. বাফার দ্রবণে যোগ করুন।
- স্ট্রেপটোমাইসিন এক গ্রামের একটি এম্পুলে ৫ সি.সি. পাতিত পানি দ্রবীভূত করে তার ০.৫ সি.সি. ১০০ সি.সি. বাফারে যোগ করুন।
- সালফালানিমাইড পাউডার ১০০ সি.সি. তৈরিকৃত বাফারে ০.৬ গ্রাম পাউডার যোগ করুন।

এগইয়ক মিশ্রণ

মুরগীর ডিম (১ দিনের) এলকোহল দ্বারা ভালভাবে পরিস্কার করে নিন। অতপর ডিমের মোটা অংশ ভেঙ্গে নিন। জেলির মত ডিমের সাদা অংশ (এ্যালবুমিন) যতদূর পারা যায় স্পেচুলা দিয়ে আলাদা করুন। এবারে ডিমের কুসুম চোষ কাগজে ঢেলে নিন। আস্তে আস্তে সাদাঅংশ কাগজ দিয়ে চুষে নিয়ে কুসুমের পর্দাটি ফাটিয়ে কুসুম একটি দাগ কাটা সিলিন্ডারে রাখুন ও মেপে নিন। ১ ভাগ ডিমের কুসুমের সাথে ২-৪ ভাগ বাফার ভালো করে মিশান। এভাবে বীর্য তরলীকরণে ডাইলুয়েন্ট তৈরি করা হয়।

বীর্য মিশ্রিতকরণ

বীর্য ডাইলুয়েন্টর সাথে মিশ্রণের পূর্বে বীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রাণুর ঘনত্ব কত তা জেনে নিতে হবে।

বীর্য ডাইলুয়েন্টর সাথে মিশ্রণের পূর্বে বীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রাণুর ঘনত্ব কত তা জেনে নিতে হবে। ধরা যাক, কোন বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ১০০০ মিলিয়ন/সি.সি.। এক্ষেত্রে বীর্যকে (১০০০ মিলিয়ন ÷ ১০ মিলিয়ন) = ১০০ গুণ বর্ধন করা যাবে (যেহেতু ১ সি.সি. বীর্যে কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে) এভাবে ১ সি.সি. আদি বীজ ১০০ সি.সি. ডাইলুয়েন্টের সাথে যোগ করা যেতে পারে। সাধারণত বীর্যকে ১০-২৫০ গুণ তরলীকৃত করা যায়। এটা অবশ্য বীর্যে অবস্থিত শুক্রাণুর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে।

বীর্য সংরক্ষণ

বীর্যকে দুভাবে সংরক্ষণ করা যায়–

- স্বল্প সময়ের জন্য ঃ ৪-৫° সে. তাপমাত্রায় ৩-৪ দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- দীর্ঘ সময়ের জন্য ঃ ৭৯° সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক বরফ ও অ্যালকোহলে এবং– ১৯৬° সে. তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেন দ্বারা সংরক্ষণ করা যায়।

কৃত্রিম উপায়ে গাভীকে পাল দেওয়ার নিয়ম

- প্রজননের জন্য গাভী চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- গাভী ঋতুচক্রের কোন্ অবস্থায় আছে তা জেনে নিতে হবে।
- গাভীকে শূটের (Chute) মধ্যে ভালভাবে আটকিয়ে নিতে হবে।
- এবার বাম হাতে গ্লোবস, গায়ে অ্যাপ্রন এবং গামবুট পরিধান করতে হবে।
- জীবানুনাশক দিয়ে হাত, পশুর মলদ্বার ও যোনির বাইরের অংশ ভালভাবে মুছে নিতে হবে এবং পিচ্ছিলকারক দিয়ে হাতের উপরে গ্লোবসকে পিচ্ছিল করে নিতে হবে।
- বাম হাতটি এবার মলদ্বার দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে এবং মলাশয় থেকে মূত্রাশয় দেয়ালের ওপর দিয়ে জননতন্ত্রের সার্ভিক্স ধরতে হবে।
- অতপর ১ সি.সি. পরিমাণ তরল বীর্য ক্যাথেটারে নিতে হবে।
- বীর্যপূর্ণ ক্যাথেটারটি ডান হাত দিয়ে ধীরে ধীরে যোনির মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে এবং বাম হাত দিয়ে ক্যাথেটারের অস্তিত্ত অনুভব করতে হবে।
- ক্যাথেটারের পলিবাল্বে চাপ দিয়ে বীর্যকে জননতন্ত্রে প্রবাহিত করতে হবে। পুরো বীর্য সার্ভিক্সে নির্গত হলে পলিবাল্বে সমপরিমাণ চাপ রেখে ক্যাথেটার বের করতে হবে।

সারমর্ম

উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি অনুন্নত দেশগুলোতেও কৃত্রিম প্রজনন কৌশল গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নে বহুল প্রচলিত। প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ষাঁড় বছরে ৫০টি গাভীর সাথে মিলিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের বেলায় একটি ষাঁড়ের বীর্য ব্যবহার করে বছরে কমপক্ষে ১০০০০ গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব। কৃত্রিম প্রজনন কৌশল সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড় আমদানি না করেও শুধুমাত্র বীর্য আমদানি করে দেশী অনুন্নত জাতের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করতে হয়, ঐ বীর্য মূল্যায়ন করতে হয়, প্রয়োজনে সংরক্ষণ করতে হয় এবং সঠিকভাবে গাভীকে পাল দেওয়াতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন দেশের বিজ্ঞানী ঘোড়ীতে সর্বপ্রথম কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হন

i. মিশরীয় বিজ্ঞানী
ii. আরব বিজ্ঞানী
iii. রাশিয়ার বিজ্ঞানী
iv. ইউরোপের বিজ্ঞানী

খ. আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প চালু হয় কত সালে?

i. ১৯৭৫-৭৬ সালে
ii. ১৯৭৬-৭৮ সালে
iii. ১৯৫৭-৫৮ সালে
iv. ১৯৭৭-৭৮ সালে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. একটি ষাঁড় বছরে ৫০টি গাভীর সাথে মিলিত হতে পারে।
খ. কৃত্রিম প্রজননে দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অপারেটরের প্রয়োজন নেই।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. কৃত্রিম যোনিতে গরম পানির তাপমাত্র - - - - - - - - - ।
খ. ২০-৫০ ভাগ শুককীটের নড়াচড়া - - - - - - - - - -।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. একটি ষাঁড় থেকে প্রতিবারে কী পরিমাণ বীর্য পাওয়া যায়।
খ. ষাঁড়ের ক্ষেত্রে বীর্যের pH কত?

পাঠ ১.৫ গর্ভাবস্থা নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- গর্ভবতী গাভীর বাহ্যিক লক্ষণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে কীভাবে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের ল্যাবরেটরী পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

গর্ভধারণ বা গর্ভাবস্থা বলতে কোনো গাভীর জরায়ু বা ইউটেরাসে বর্ধনশীল বাচ্চার উপস্থিতিকেই বোঝায়। গাভীকে পাল দেওয়া থেকে বাচ্চা প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে গর্ভধারণকাল বলে। গাভীর গর্ভধারণকাল ২৮০ $\pm$ ১০ দিন।

গর্ভধারণ নির্ণয় একটি অত্যন্ত জটিল বিয়ষ। সাধারণত পাল দেওয়ার ৬-১২ সপ্তাহ পর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

গর্ভধারণ নির্ণয় একটি জটিল বিষয়। অথচ সাফল্যজনক খামার ব্যবস্থাপনায় পাল দেওয়ার পর গাভী গর্ভবতী হয়েছে কিনা এটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণত পাল দেওয়ার ৬-১২ সপ্তাহ পর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্থা বা গর্ভধারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য (Objectives of pregnancy diagnosis)

- যে সমস্ত গাভী অনুর্বরতা (Infertility) বা বন্ধ্যাত্বের (Sterility) কারণে বাচ্চা ধারণ করতে পারে না তাদেরকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা করানো অথবা খামার থেকে ছাঁটাই করা।
- গর্ভবতী গাভীকে চিহ্নিত করে শুরু থেকেই তার জন্য পৃথক খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- অনেক গাভী গর্ভধারণ না করেও এমন কতকগুলো লক্ষণ প্রকাশ করে যাতে মনে হয় গাভীটি গর্ভবতী। গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে এধরনের গাভী চিহ্নিত করে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় রোধ করা যায় অপরদিকে অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হওয়া যায়।

গর্ভাবস্থা বা গর্ভধারণ নির্ণয়ের পদ্ধতি (Methods of pregnancy diagnosis)

গর্ভাবস্থা বা গর্ভধারণ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো হলো –

১. বাহ্যিক লক্ষণ দেখে (Sign of pregnancy)
২. রেকটাল পালপেশন পদ্ধতি (Rectal palpation method)
৩. ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে (Laboratory tests)

গর্ভাবস্থার বাহ্যিক লক্ষণ (Sign of pregnancy)

গাভী গর্ভাধারণ করলে যে সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো –

গর্ভধারণের প্রাথমিক চিহ্নই হলো গাভীর ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া।

- ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া– গর্ভধারণের প্রাথমিক চিহ্নই হলো গাভীর ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া। পাল দেওয়ার পর ঋতুচক্র বন্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই গাভীটি গর্ভবতী হয়েছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য অনেক সময় পাল দেওয়ার পর গাভী গর্ভবতী না হলেও বিভিন্ন কারণে ঋতুচক্র বন্ধ হতে পারে। আবার গাভী গর্ভবতী হলেও ঋতুচক্র বা গরম হওয়ার লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে।
- গাভী নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- গাভীর দেহে চর্বি জমতে শুরু করে।
- ভ্রুনের বৃদ্ধি এবং ওলান ও জরায়ু স্ফীত হওয়ার কারণে গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময় থেকে গাভীর দৈহিক ওজন বাড়তে থাকে।
- গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গাভীর তলপেটের (Abdomen) আয়তন বেড়ে যায়।
- গাভীর ওলান দৃঢ়, চকচকে এবং আকারে বড় হয়। আর বাঁটগুলো তৈলাক্ত মনে হয়।

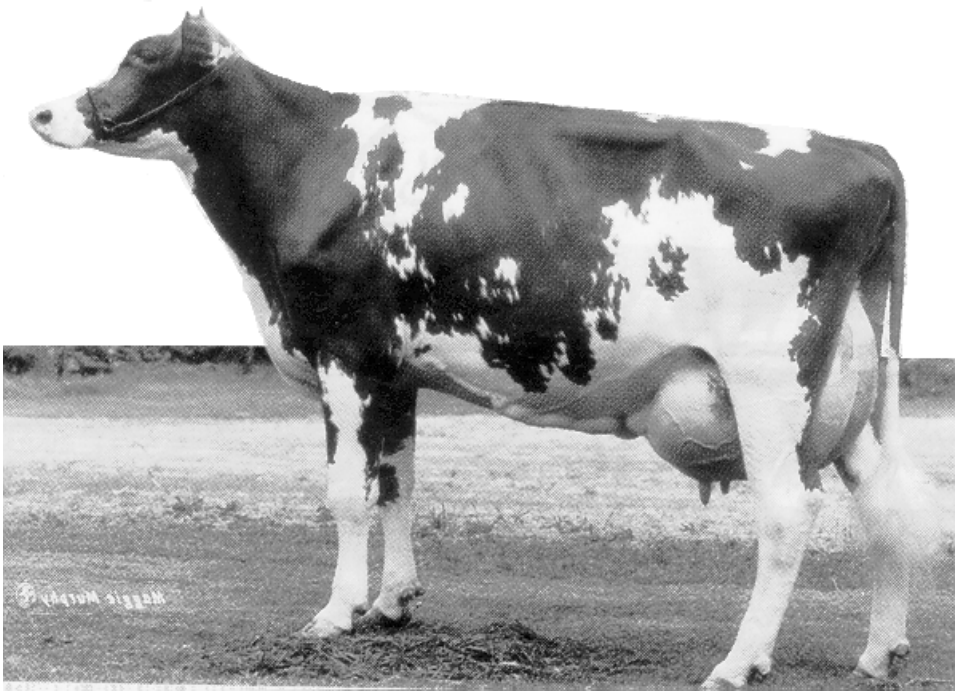

চিত্র ৮ ঃ একটি গর্ভবতী গাভী

গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের জন্য রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ। এই পদ্ধতিতে খুব কম খরচে অল্প সময়ে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়।

রেকটাল পালপেশন পদ্ধতি (Rectal palpation method)

গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের জন্য এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ। এই পদ্ধতিতে খুব কম খরচে অল্প সময়ে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়। রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে গাভী গর্ভবতী হয়েছে কিনা শুধুমাত্র এটাই নির্ণয় করা হয় না, গাভী কতদিনের গর্ভবতী তাও নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে যদিও কোনো যন্ত্রপাতি বা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু পরীক্ষককে (যিনি গর্ভাবস্থা নির্ণয় করবেন) যথেষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হয়।

রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে গর্ভবস্থা নির্ণয়ের জন্য যা করতে হবে–

- গাভীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সুবিধাজনক জায়গায় আটকাতে হবে।
- যিনি গর্ভাবস্থা নির্ণয় করবেন তাঁকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
- গায়ে এ্যাপ্রোন, পায়ে গামবুট এবং সম্ভব হলে বাম হাতে গ্লাভস পড়ে নিতে হবে।
- গাভীর যোনি ও মলদ্বার অল্প গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তুলো দিয়ে মুছে নিতে হবে এবং ভালো পিচ্ছিলকারক পদার্থ যেমন ভেসিলিন দিয়ে পিচ্ছিল করে নিতে হবে। যিনি গর্ভাবস্থা নির্ণয় করবেন তার হাতও পিচ্ছিল করে নিতে হবে।
- গাভীর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে গাভীর লেজ তুলে ধরতে হবে এবং বাম হাত মলদ্বার দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে।
- হাতের কব্জি ঢুকে গেলে মলদ্বারের প্রাচীরের উপর থেকে গাভীর জননতন্ত্রের অংশগুলোর অবস্থা অনুভব করতে হবে।

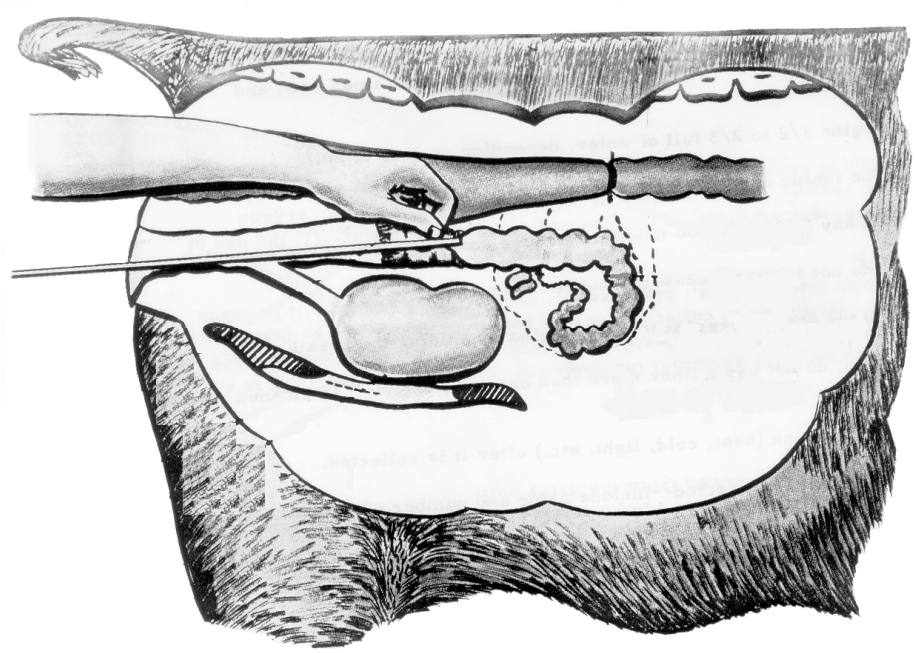

চিত্র ৯ ঃ রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে গর্ভাবস্থা নির্ণয়

গাভীর গর্ভাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম অনুভূতি অনুভব করা যাবে।

গাভী গর্ভবতী না হলে

ভালভা থেকে ৬ হতে ১০ ইঞ্চি পরই সার্ভিক্স অনুভূত হবে। জরায়ুর দুটো শাখাই সমান থাকবে। জরায়ুর শাখা দুটোর মাঝখানে ঢালু থাকবে। বকনা গাভীর ক্ষেত্রে সার্ভিক্স, জরায়ুর শাখা এবং ডিম্বাশয় হাতের তালু দিয়ে ধরা যাবে। ডিম্বাশয়ে করপাস লিউটিয়াম থাকবে না।

জরায়ুর যে শাখায় (সাধারণত ডান শাখায়) ভ্রুণ থাকবে তা অন্য শাখা অপেক্ষা কিছুটা মোটা হবে।

গাভী ১ মাসের গর্ভবতী হলে

জরায়ুর যে শাখায় (সাধারণত ডান শাখায়) ভ্রুণ থাকবে তা অন্য শাখা অপেক্ষা কিছুটা মোটা হবে। ভ্রুণ ধারণকারী শাখার ডিম্বাশয়ে করপাস লিউটিয়াম উপস্থিত থাকবে। সার্ভিক্সের বাইরের মুখে ঘন অর্ধকঠিন মিউকাস থাকবে। জরায়ু পাতলা ও হালকা মনে হবে এবং এর ভেতরে তরল পদার্থ রয়েছে বলে অনুভূত হবে। ভ্রুণ আনুমানিক ১/২ ইঞ্চি লম্বা হবে এবং এর চার পাশে তরল পদার্থ বেষ্টিত রয়েছে বলে মনে হবে।

গাভী ২ মাসের গর্ভবতী হলে

ভ্রুণ ধারণকারী জরায়ুর শাখাটি আরো মোটা হবে এবং সহজেই অনুভব করা যাবে। জরায়ুর শাখাটি পিচ্ছিল হবে। ভ্রুণ আকারে ৫ সপ্তাহে মার্বেলের মতো এবং ৭ সপ্তাহে মুরগির মতো মনে হবে।

গাভী ৩ মাসের গর্ভবতী হলে

ভ্রুণ ধারণকারী জরায়ুর শাখাটি আরো মোটা হবে এবং এর চারপাশের তরল পদার্থের পরিমাণ ও বাড়বে। জরায়ুর শাখার ধমনী হাত দিয়ে বোঝা যাবে। জরায়ুর স্থান পরিবর্তিত হয়ে তলপেটে যাবে। ভ্রুণ প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা হবে এবং ভ্রুণের হৃৎপিন্ডের স্পন্দন অনুভব করা যাবে।

গাভী ৪ মাসের গর্ভবতী হলে কটিলিডনের উপস্থিতি অনুভব করা যায় এবং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গাভী ৪ মাসের গর্ভবতী হলে

কটিলিডনের উপস্থিতি অনুভব করা যায় এবং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভ্রুণের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ইঞ্চির মতো হয়। ভ্রুণের মাথা মাঝারি আকারের পেয়ারার মতো হবে। মাথার এই আকার দিয়েই গর্ভধারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়। মলদ্বার দিয়ে হাত প্রবেশ করালে প্রথমেই মাথার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

গাভী ৫ মাসের গর্ভবতী হলে

বাচ্চাসহ জরায়ু হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তবে অনেক সময় বাচ্চার সামনের পা বা বাচ্চা হাতে লাগতেও পারে।

৫ মাসের পর থেকে বাহ্যিক লক্ষণ দেখেই বোঝা যাবে যে, গাভী অন্তঃসত্ত্বা।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা (Laboratory tests)

- **বেরিয়াম ক্লোরাইড পরীক্ষা ঃ** ৫-৬ ফোঁটা ১% বেরিয়াম ক্লোরাইড ৫ মি.লি. পরিমাণ মূত্রের সাথে মেশালে যদি মূত্রের রঙ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঐ গাভীটি গর্ভবতী। কিন্তু যদি মূত্রের রং পরিবর্তিত হয়ে সাদা রঙয়ের অধঃক্ষেপ পড়ে তাহলে বুঝতে হবে গাভীটি গর্ভবতী নয়। তবে এই পরীক্ষাটি ১০০% নির্ভরযোগ্য নয়।
- **স্ক্যানিং ঃ** 'OVISCAN' নামক যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়।
- রক্তরসে গামা-গ্লোবিউলিনের উপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমেও গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়।

সারমর্ম

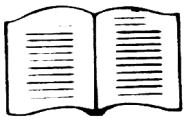

গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় একটি জটিল বিষয়। গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন গর্ভবতী গাভীর জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা নেওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি খামারকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করা যায়। বাহ্যিক লক্ষণ, রেকটাল পালপেশন ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষা– এই তিনভাবে গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়। তবে গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের জন্য রেকটাল পালপেশন সবচেয়ে সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বেরিয়াম ক্লোরাইড পরীক্ষায় কতো ফোঁটা বেরিয়াম ক্লোরাইড মূত্রের সাথে মেশাতে হয়?

i. ৫-৬ ফোঁটা
ii. ৮-১০ ফোঁটা
iii. ৩-৪ ফোঁটা
iv. ৬-৭ ফোঁটা

খ. ১ মাসের গর্ভবতী গাভীর ভ্রুণ কতটুকু লম্বা হয়?

i. ১ ইঞ্চি
ii. ১/২ ইঞ্চি
iii. ৩/৪ ইঞ্চি
iv. ১১/২ ইঞ্চি

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গাভী গর্ভবতী হলে ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যায়।
খ. গর্ভবতী গাভীর বাঁটগুলো খসখসে হয়ে যায়।

৩। শূণ্যস্থান পুরণ করুন।

ক. গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের সবচেয়ে সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতি হলো .....।
খ. গর্ভাবস্থা নির্ণয়ে ..... মলদ্বার দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. স্ক্যানিং এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কী?
খ. গর্ভবতী গাভীতে কটিলিডনের উপস্থিতি অনুভব করা যায় কত মাস বয়সে?

পাঠ ১.৬ গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রসবের সময় গাভীর কী ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা বলতে পারবেন।
- প্রসবের পর কী কী করত হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

গাভী থেকে সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে পাল দেওয়ার পর থেকে শুরু করে বাচ্চা প্রসবের পর পর্যন্ত সময়টুকুতে সঠিক যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে গাভী ও বাছুরের মারাত্তক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে গাভী পালন লাভজনক না হয়ে লোকসানে পর্যবসিত হতে পারে।

গাভীর গর্ভধারণকাল গড়ে ২৮০ দিন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই পাল দেওয়া হোক না কেনো কখন পাল দেওয়া হয়েছে সেই সময়টি মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি গাভীর স্বাস্থ্যরেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গাভী গর্ভধারণ করেছে কিনা এই বিষয়টিও নিশ্চিত হতে হবে।

গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা (Care and management of cow during pregnancy)

গাভীর গর্ভধারণকাল গড়ে ২৮০ দিন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই পাল দেওয়া হোক না কেনো কখন পাল দেওয়া হয়েছে সেই সময়টি মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি গাভীর স্বাস্থ্যরেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গাভী গর্ভধারণ করেছে কিনা এই বিষয়টিও নিশ্চিত হতে হবে। দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ৬ মাস পর্যন্ত যত্ন, পরিচর্যা, খাদ্য সরবরাহ ও দুধ দোহন স্বাভাবিকভাবেই চলবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক খাদ্যের অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হলে ০.৫-১.০ কেজি, ৩০০-৪০০ কেজি হলে ১.০-১.৫ কেজি এবং ৪০০-৫০০ কেজি হলে ১.৫-২.৭৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ দিতে হবে। বয়সভেদে অতিরিক্ত এই খাদ্য চাহিদাকে প্রেগ্‌নেন্সি এ্যালাউন্স (Pregnancy allowance) বলে। গর্ভবতী গাভীকে এই বয়সে খাদ্য প্রদানে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো– (ক) গাভীর কোনভাবেই চর্বি জমতে দেওয়া যাবে না এবং (খ) দানাদার মিশ্রণের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে বকনা বাছুরের ক্ষেত্রে পাল দেওয়ার পর থেকেই সুষম খাদ্য সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত। কারণ এই সময় গর্ভের বাচ্চা ও বকনা বাছুরের শরীরের বৃদ্ধি একই সাথে ঘটে থাকে। গর্ভবতী বকনা বা গাভীকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় বকনা/গাভী যেনো প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার পানি খেতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারণি ১.২-এ ৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি ১.২ ঃ ৬ মাসের অধিক গর্ভবতী গাভীর ওজন ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য চাহিদা

		দৈনিক খাদ্য চাহিদা (কেজি)			
গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন (কেজি)	আঁশ জাতীয় খাদ্য (কাঁচা ঘাস/খড়)		দানাদার খাদ্য	
		গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী ৬ মাসের অধিক	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী ৬ মাসের অধিক
৩০০	২.০	৩৬.০/৯০	৩০.০/৭.৫০	১.০০	১.৫০
৪০০	২.০	৪০.০/১০.০	৩৬.০/৯.০	২.০০	৩.৫০

কাঁচা ঘাস এবং শুকনো খড়ের মিশ্রণ আনুপাতিক হারে সরবরাহ করতে হবে। সাধারণত চার কেজি কাঁচা ঘাস মোটামুটিভাবে এক কেজি শুকনো খড়ের সমতূল্য।

দানাদার মিশ্রণ সব সময় সহজ লভ্য ও সস্তা খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে এ জন্য পুষ্টি মাত্রার ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ব্যবহারিক মাত্রার একটি হিসাব নিচে দেয়া হলো।

	খাদ্যের নাম	গঠন (শতকরা হার)
ক.	দানাদার খাদ্য (গম/ভূট্টা/খেসারি ভাংগা)	১৫-২৫
খ	ভূষি ও কুড়া (গম/চাল/খেসারি)	৪৫-৫৫
গ.	খৈল (তিল/নারিকেল/তুলা বীজ)	১৫-২০
ঘ.	মাছের গুড়া/সয়াবিন মিল	৪-৫
ঙ.	খনিজ ও লবণ (লবণ ১.০% এবং হাড়ের গুড়া/লাইম স্টোন পাউডার/ঝিনুকের পাউডার/ডিমের খোসার পাউডার ইত্যাদি ৩-৪%)	৪-৫

প্রসবের প্রায় দু'সপ্তাহ পূর্ব থেকে বকনা বা গাভীকে একটু বড় ধরনের ঘরে পৃথকভাবে খোলা অবস্থায় রাখতে হবে। প্রতিদিন হাঁটাচলার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষ্কার নরম বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে গর্ভাবস্থায় যেন কোনোভাবেই বকনা বা গাভী উত্তেজিত না হয় বা আঘাত না পায়। গরম হওয়া গাভী বা ষাঁড় যেন গর্ভবতী বকনা বা গাভীর উপর লাফ না দেয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময় বকনা বা গাভীর খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিতে হবে। পায়খানা পরিষ্কার ও শরীর ঠান্ডা থাকে এ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা (Care and management of cow during parturition)

প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন– ওলান ফুলে যায়, ভালভা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে।

প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন– ওলান ফুলে যায়, ভালভা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে।

প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমন– ওলান ফুলে যায়, ভালভা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে। এই সময় গাভীকে প্রসূতি ঘরে নেওয়া উচিত। প্রসূতি ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমক্ত হতে হবে এবং আলো-বাতাস চলাচলের ও ভালো বিছানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আবার বর্ষাকাল এবং শীতকাল ব্যাতিত অন্য সময়ে খামারের কাছাকাছি পরিষ্কার, ছায়াযুক্ত এবং ঘাস আছে এমন স্থানেও নেওয়া যেতে পারে। প্রসবের সময় গাভীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাধারণত প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পাবার ১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চা প্রসব হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রসব ব্যাথা শুরু হওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব না হয় তবে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে সাহায্য ছাড়াই গাভী সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তবে অনেক সময় হাত দিয়ে সামান্য সাহায্য করতে হয়। প্রসবের শুরুতেই বাচ্চার সমনের পা বেরিয়ে আসে, এরপর আসে নাক **(চিত্র .)**। যেকোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই জরুরী ভিত্তিতে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

চিত্র ১০ ঃ গাভী থেকে বাচ্চা প্রসব হচ্ছে

বাচ্চা প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।

প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা (Care and management of cow after parturition)

- বাচ্চা প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।
- গাভীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই গাভীকে হালকা গরম পানি বা এধরনের পানি দিয়ে গুড়ের সরবত তৈরি করে খাওয়ানো ভালো।
- গাভী যাতে নবজাতক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।
- প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।
- সাধারণত প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। যদি ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও গর্ভফুল বের না হয় তবে গাভীকে আরগট মিশ্রণ (Ergot mixture) খাওয়ানো যেতে পারে। ১২ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।
- গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী যেনো গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- দুধজ্বর ও ম্যাস্টাইটিস রোগের সম্ভাবনা কমাবার জন্য বাচ্চা প্রসবের পর ১-২ দিন পর্যন্ত গাভীকে সম্পূর্ণভাবে দোহন না করাই ভালো। বাছুরকে কাচলা দুধ বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।
- গাভীকে প্রথমত হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একইসাথে অল্পপরিমাণ কাঁচা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

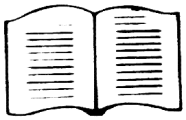

সারমর্ম

সুস্থ-সবল বাচ্চা পেতে এবং গাভীকে রোগমুক্ত ও অধিক উৎপাদনশীল রাখতে হলে গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। গর্ভাবস্থায় গাভীকে আরামদায়ক বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রসবের সময় গাভীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। প্রসবের পর গাভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গরম রাখতে হবে। গর্ভফুল বের হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিয়মমাফিক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. সাধারণত প্রসবের কতো ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল বের হয়ে আসে?

i. ৫-৬ ঘন্টা
ii. ২-৪ ঘন্টা
iii. ৭-৮ ঘন্টা
iv. ৮-১২ ঘন্টা

খ. প্রসবের সময় বাচ্চার শরীরের কোন্ অংশ প্রথম বের হয়ে আসে?

i. মাথা
ii. পেছনের পা
iii. সামনের পা
iv. নাক

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গর্ভবতী বকনা বা গাভীকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য কম পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত।

খ. প্রসবের দুসপ্তাহ পূর্ব থেকে বকনা বা গাভীকে পৃথকভাবে রাখা উচিত।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. প্রসবের কিছুসময় পূর্বে গাভীর ভালভা - - - - - - - - - যায়।

খ. গর্ভাবস্থায় গাভীকে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ - - - - - - - খাওয়াতে হবে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও গর্ভফুল বের না হলে গাভীকে কী খাওয়ানো উচিত?

খ. গর্ভাবস্থার কোন্ পর্যায় থেকে গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করে দিতে হবে?

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৭ গরম হওয়া বকনা বা গাভী শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বকনা বা গাভী গরম হওয়ার লক্ষণগুলো বলতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এ কোর্সবইয়ের পাঠ ১.৩ এর বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। সঠিকভাবে প্রজননের জন্য গাভী গরম হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাভী গরম হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রজনন না করালে গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। সাধারণত গাভী গরম হওয়ার ৮ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করাতে হয়। এজন্যই গাভী কখন গরম অবস্থায় এসেছে তা জানা এবং বোঝা খুবই প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. গরম অবস্থায় এসেছে এমন ধরনের বকনা বা গাভী।
২. গ্লাভস, স্পেকুলাম।
৩. কলম, ব্যবহারিক খাতা।

কাজের ধারা

- গরম হওয়া বকনা বা গাভীতে যে ধরনের বাহ্যিক লক্ষণ থাকা উচিত সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন।
- হাতে গ্লাভস পড়ে গাভীর যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করে ভেতরটা পর্যবেক্ষণ করুন।
- স্পেকুলামের সাহায্যে সার্ভিক্সের মুখ পর্যবেক্ষণ করুন
- আপনার পর্যবেক্ষণগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।
- পর্যবেক্ষণকৃত গাভীটি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য লিখুন।
- আপনার ব্যবহারিক খাতাটি টিউটরকে দেখান এবং তাতে সই নিন।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৮ গর্ভবতী বকনা বা গাভী শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বকনা বা গাভী গর্ভবতী কিনা তা বলতে পারবেন
- বকনা বা গাভী কতদিনের গর্ভবতী তা বলতে পারবেন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গর্ভবতী গাভীকে চিহ্নিত করে শুরু থেকেই পৃথক খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য এবং অনুর্বর ও বন্ধ্যা গাভী চিহ্নিত করার জন্য গর্ভাবস্থা নির্ণয় অত্যন্ত জরুরী। গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। তবে সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো রেকটাল পালপেশন পদ্ধতি। এ কোর্সবইয়ের পাঠ ১.৫ এর রেকটাল পালপেশন পদ্ধতি অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন কোনো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় না অপরদিকে খুব কম খরচে এবং অল্প সময়ে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি বকনা বা গাভী।
২. বকনা বা গাভীকে আটকানোর জন্য জায়গা।
৩. এ্যাপ্রোন, গামবুট, গ্লাভস, গরম পানি, পিচ্ছিলকারক পদার্থ যেমন– ভেসিলিন, তুলা, রশি ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- বকনা বা গাভীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সুবিধাজনক জায়গায় আটকিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এ্যাপ্রোন গায়ে দিন এবং গামবুট পড়ে ফেলুন। বামহাতে গ্লাভস পড়ে ফেলুন।
- বকনা বা গাভীর যোনি ও মলদ্বার অল্প গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তুলো দিয়ে মুছে ফেলুন এবং ভেসিলিন লাগিয়ে পিচ্ছিল করে নিন।
- গাভীর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে গাভীর লেজ তুলে ধরুন এবং বাম হাত মলদ্বারের প্রাচীরের উপর থেকে গাভীর জননতন্ত্রের অংশগুলোর অবস্থা অনুভব করুন।
- আপনার অনুভূতি গাভীর গর্ভাবস্থার কোন্ পর্যায় নির্দেশ করে তা এই কোর্সবইয়ের পাঠ ১.৫ থেকে জেনে নিন।
- আপনার ব্যবহারিক খাতাটি টিউটরকে দেখান এবং তাতে সই নিন।

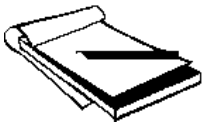

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাছাই সূচক পদ্ধতিটি বর্ণনা করুন।

২। গ্রেডিংআপের মাধ্যমে কীভাবে দেশী অনুন্নত জাতের গাভীর উন্নয়ন ঘটানো যায় তা বর্ণনা করুন

৩। ষাঁড়ের জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ লিপিবদ্ধ করুন।

৪। চিত্রসহ একটি গাভীর জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করুন।

৫। গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণগুলো কী কী?

৬। কৃত্রিম যোনির বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লিখুন।

৭। গর্ভধারণ নির্নয়ের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।

৮। ডাইলুয়েন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

৯। বীর্য সংরক্ষণ কীভাবে করবেন লিখুন।

১০। প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন কীভাবে নিবেন?

উত্তরমালা ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১.	ক ii,	খ iv,
২.	ক. স,	খ. মি,
৩.	ক. ক্লোজব্রিডিং,	খ. অর্থ, সময়,
৪.	ক. বাছাই ও সমাগম,	খ. গ্রেডিংআপ,

পাঠ ১.২

১.	ক iii,	খ i,
২.	ক. স,	খ. মি,
৩.	ক. সারভিক্স,	খ. বিট্র্যাক্টর,
৪.	ক. শুক্রানু,	খ. ডিম্বাশয়ে,

পাঠ ১.৩

১.	ক i,	খ i,
২.	ক. মি,	খ. স,
৩.	ক. লিউটিরাল,	খ. ১০-১২ ঘন্টা,
৪.	ক. গড়ে ২১ দিন,	খ. ৬-১৮ ঘন্টা,

পাঠ ১.৪

১.	ক-ii,	খ-i,
২.	ক. স,	খ. স,
৩.	ক. ৪৩-৪৫° সে.,	খ. Good motility,
৪.	ক. ৫-৮ সি.সি.,	খ. ৬-৭,

পাঠ ১.৫

১.	ক-i,	খ-ii,
২.	ক. স,	খ. মি,
৩.	ক. রেকটাল পালপেশন পদ্ধতি,	খ. বাম হাত,
৪.	ক. OVISCAN,	খ. ৪ মাস,